আমিকের ১০ বছর

আহ্ছানিয়া মিশন

মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী (আমিক)

আমিকের ১০ বছর পূর্তি

স্মরনিকা

আহ্ছানিয়া মিশন

মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক)

উপদেষ্টা সম্পাদক

প্রফেসর বশিরা মান্নান
মিসেস্ সাজেদা হুমায়ুন কবির
এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদক

প্রফেসর নূরুল ইসলাম

সহযোগী সম্পাদক

ইকবাল মাসুদ

বিশেষ সহযোগিতায়

ডাঃ সারওয়ার আলী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বেনেটা লিঃ

কাজী ফারহাদ আলভী

প্রচ্ছদ

আবিদ এ আজাদ

কম্পিউটার ডিজাইন

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

মুদ্রণে

আমাদের বাংলা প্রেস লিঃ
৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রকাশনায়

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

প্রকাশকাল

জুলাই ২০০০

মাদকাসক্তরা
আমাদেরই
সন্তান,
আসুন, সুস্থ-
সুন্দর জীবনের
পথে আমরা
তাদেরকে
সহায়তা
করি

বিষয়সূচি

বাণী

বিচারপতি এ.কে.এম. নূরুল ইসলাম/২
অধ্যাপক ডাঃ এম. আমানউল্লাহ/৩
মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী/৪
ময়সূদ মান্নান/৫

উদ্ধৃতি

ধূমপান প্রসঙ্গে শিক্ষকদের করণীয়/খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা/৬

প্রবন্ধ

মাদক বিরোধী সচেতনতা ও কার্যক্রম/ডঃ এম. এনামুল হক/৭
মাদক সমস্যা নিরসনে আন্তর্জাতিক সহায়তা/মোঃ রশিদুল হক/১১
Drug Abuse & Families/Dr. Shamim Matin Chowdhury/১৩
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঃ তামাক মুক্ত বিশ্বের জানালা/ডাঃ এম. এ. হাই/১৬
মাদকের অপব্যবহার ও আমাদের সমাজ/ডঃ আবদুল হাকিম সরকার/১৯
মাদকদ্রব্য বর্জনে যুব সমাজের ভূমিকা/এম. এহছানুর রহমান/২২
স্থানীয় পর্যায়ে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন/খন্দকার জাকিউর রহমান/২৬
আল-কুরআন ও আলহাদীসে মাদক প্রসঙ্গ/সংগৃহীত/৩০

গল্প

বুমেরাং/অধ্যাপিকা রওশন আরা ফিরোজ/৩৪

কবিতা

Eradication of Tobacco/Capt. (Retd.) M.M. Feroz/৩৮
মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে তার কাছে বলছি/হাবীবা খানম/৩৯

প্রতিবেদন

আমিক ও আমিকের দশ বছর/ইকবাল মাসুদ/৪০

এদেশে প্রচলিত মাদকদ্রব্য/৪৬
গণমাধ্যমে আমিক কার্যক্রম/৪৮
আমিক প্রকাশিত পোষ্টার/৫০
আমিক প্রকাশিত স্টিকার/৫২
চিত্রে আমিক কার্যক্রম/৫৩
আমিক কেন্দ্রীয় কমিটি/৫৭

ভূমিকা

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক)-এর দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচেছ। বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আনন্দের।

আমাদের মনে পড়ে এক দশক আগে ১৯৯০ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি আমিকের কার্যক্রম শুরু করেছিল। ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে আমিকের বিশাল নেটওয়ার্ক। বিভাগ, জেলা, উপজেলা থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে আমিকের কার্যক্রম। মাদকদ্রব্যের সরবরাহ ও চাহিদা হ্রাস, চিকিৎসা ও চিকিৎসোত্তর পুনর্বাসন এবং কর্মএলাকায় মাদকবিরোধী সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমিক যে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে তা আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হচেছ।

আমরা আশা করি দেশের সর্বস্তরের জনগণ এই মাদকবিরোধী কার্যক্রমে যথাযথ ভূমিকা রাখবেন। আজ মাদকব্যবসায়ীরা কোমলমতি ছাত্র ও যুবসমাজকে প্ররোচিত করে হাতে তুলে দিচেছ নেশার সামগ্রী, যা ধ্বংস করছে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে। এর প্রভাব পড়ছে দেশের অর্থনীতিতে এবং অবক্ষয় ঘটছে সামাজিক মূল্যবোধের-যার প্রভাব অত্যন্ত সুদূর প্রসারী।

আমিকের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচিছ। আমরা মনে করি, সুস্থ ও সুন্দর জীবনের জন্য দেশের যুবসমাজের সাথে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসবেন এবং সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় আমিকের কার্যক্রম আগামীতে আরো ব্যাপক ও গতিশীল হবে।

কাজী রফিকুল আলম
নির্বাহী পরিচালক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

বাণী

সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি
গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
এবং প্রেসিডেন্ট
আমিক কেন্দ্রীয় কমিটি।

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক)-এর পক্ষ হতে দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মাদক সমস্যা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম মারাত্মক সমস্যা, মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা একদিকে যেমন নিজেদের ধ্বংস করছে অন্যদিকে তেমন দেশের সামাজিক অবস্থা ও অর্থনীতিতে আঘাত হানছে। সর্বনাশা মাদকদ্রব্য কোন ভৌগলিক সীমা মানছে না বরং প্রতিদিনই বিস্তার লাভ করছে। এ অবস্থায় দেশের জনগণের সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলতে হবে, গড়ে তুলতে হবে মাদক বিরোধী সামাজিক আন্দোলন, আর এই লক্ষ্য নিয়ে 'আমিক' দেশের ৫৪টি জেলার ১৫০টি উপজেলায় মাদক বিরোধী কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি সমূহের মাধ্যমে মাদক বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরা আশা করি মাদকদ্রব্যের এই অভিশাপ থেকে দেশকে এবং বিশেষ করে দেশের যুবসমাজকে রক্ষা করতে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ্তালার রহমতে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজ থেকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হবে- এ আমার প্রত্যাশা ও দৃঢ় প্রত্যয়।

বিচারপতি এ.কে.এম. নূরুল ইসলাম

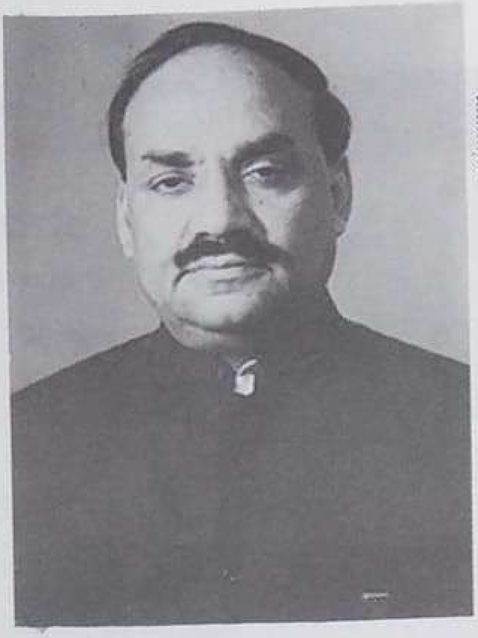

বাণী

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে এদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এক সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ইতোমধ্যে এর প্রভাবে আমাদের অনেক সম্ভাবনাময় তরুণের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ৮৫ ভাগ মাদকাসক্তের বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে। তরুণ সমাজকে এই মাদক থেকে দূরে রাখার জন্য সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী এবং সমাজ সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে বিশেষ কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এই কার্যক্রম নিঃসন্দেহে প্রশংসা পাওয়ার দাবী রাখে।আমরা মনেকরি সরকার বা কারোর একার পক্ষে এই সমস্যা সমাধান করা কষ্টসাধ্য। এ জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস।

আমি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এই কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবি হউক।

অধ্যাপক ডাঃ এম. আমানউল্লাহ

বাণী

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

'আমিক'-এর দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই এ দেশও মাদক সমস্যায় জর্জরিত। মাদকাসক্তি ও মাদক অপব্যবহারের কারণে পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে পড়ছে, অবক্ষয় ঘটছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের। এর পাশাপাশি মাদকাসক্তির সাথে যোগ হচ্ছে সন্ত্রাস ও চোরাচালান, যা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে।

'আমিক' বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মাদক বিরোধী জনমত ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ভয়াবহ সমস্যার সমাধান কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। আমিক এর মতো অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকেও সরকারের পাশাপাশি কাজ করতে হবে এবং সর্বস্তরের জনগণকে সমাজ থেকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নির্মূল করার লক্ষ্যে এক সাথে এগিয়ে আসতে হবে।

আমিক-এর দশ বছর পূর্তিতে আমরা আশাকরি আমিক এর মাদক বিরোধী কর্মকান্ড আগামী দিনে আরও জোরদার ও প্রতিশ্রুতিশীল হবে।

মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী

MESSAGE

Counsellor
Bangladesh Parmanent Mission
To the UN, USA

With the passage of time, we have just entered another millennium with a number of blessings and curses of the modern free market scientific civilization. Among the worst possible curses of present time are the dreadful disease of AIDS and the alarming affect of drug abuse and its illicit trafficking. From the beginning of the ninties Dhaka Ahsania Mission through its anti drug project AMIK is dedicated in fighting the spread of drug abuse in Bangladesh. I personally had the opportunity to associate myself with this movement from its inception as a humble worker, firstly as the Founder President of the City Unit of AMIK and then as the Secretary General of the Central Committee. During my long association with Dhaka Ahsania Miission, I had the privilege to visit a number of branches of AMIK located in different parts of Bangladesh and came to know about its success story

in making people of various ages aware and involved in the campaign against drug abuse. The recovery of young drug addicts always allured me with the feeling of joy by being associated in saving a human life. Therefore, it gives me immense pleasure to know that AMIK Central Committee is bringing out a Souvenir celebrating its Tenth Founding Anniversary as well as the International Anti Drug Day on 26th June, 2000. I strongly believe AMIK will continue its noble task in the coming days with more strength and further public participation. Finally, I wish the Central Committee Members and specially the souvenir editor and her team all the best in their creative venture.

Mosud Mannan

ধূমপান প্রসঙ্গে শিক্ষকদের করনীয়

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা

শিক্ষক ধূমপানের অপকারিতা সম্বন্ধে প্রতি শ্রেণীতে দুই একটি পাঠ দিবেন।

ধূমপান অত্যন্ত অনিষ্টকর। আজকাল বালকদিগের মধ্যে সিগারেট ব্যবহার অত্যধিক হইয়া উঠিয়াছে। সিগারেটে দুইটি বিষাক্ত পদার্থ আছে, একটির নাম নিকোটিন, অপরটির নাম কার্বন মনোক্সাইড। প্রথমটি তামাকের বিষময় সারাংশ; দ্বিতীয়টি বিষাক্ত বাষ্প; উহা রক্ত দূষিত করে। ধূমপানে শ্বেতবর্ণ রক্তকণিকাগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে; সুতরাং নিউমোনিয়া, জ্বর-বিকার প্রভৃতি উৎপাদক বীজ রক্তে প্রবেশ করিলে উহাদিগকে নষ্ট করিতে পারে না। এইজন্য সিগারেটসেবী বালকের নিউমোনিয়া হইলে রক্ষা পওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

বহরমপুরের ধূমপান-নিবারণী সভার জনৈক সভ্য লিখিয়াছেন,- "সিগারেটের ধূমে শরীর ও মন উভয়েরই বিকাশের হানি হয় । ইহাতে হৃদয় দুর্বল হয়, মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি শিথিল হয় এবং তাহার ফলে স্মৃতিশক্তিরও হ্রাস হয়। ধূমপানের প্রাক্কালে বালকদিগকে রুগ্ন হইতে দেখা যায়।" সুবিচক্ষণ চিকিৎসক ডাক্তার কোর্ব্বস্ বলেন,- "সিগারেট সেবন-বিশেষতঃ অভুক্তাবস্থায়-উন্মত্ততার প্রধান কারণ।" ডাক্তার সি.এইচ, ক্লিন্টন্ বলেন,- "সিগারেট সেবনে নৈতিক বৃত্তিগুলি জড়তাগ্রস্ত হয়। সিগারেটসেবী দুরাচার ঠিক অহিফেনসেবী দুর্বৃত্তের ন্যায় মিথ্যা কথা বলে ও চুরি করে। অহিফেন ও সিগারেটের ধূম সমান অনিষ্টকর।" চরিত্রশোধন বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক মাননীয় জর্জ্জ টরেন্স সাহেব বলিয়াছেন, - "সিগারেট মদ্যের দোকান অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট করিতেছে।" তাঁহার তত্ত্বাবধানে অবস্থিত অভিযুক্ত বালকের মধ্যে শতকরা ৮৫ জন সিগারেট সেবনে আসক্ত প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) রচিত 'টিচার্স ম্যানুয়াল' থেকে সংকলিত।

মাদক বিরোধী সচেতনতা ও কার্যক্রম

ডঃ এম. এনামুল হক

বিশ্বব্যাপী সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বের প্রতি মাদক সমস্যা বর্তমানে হুমকী স্বরূপ। এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ অর্থ স্বাধীন, মুক্ত জীবনের প্রতি সমর্থন দেয়া। এ বিষয়ে বাংলাদেশী সমাজকর্মীরা প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন এবং রাখছেন। আজকের দিনের কার্যক্রম এরই ফলশ্রুতি।

বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সমস্যা এই মাদক। একটি দেশও এর কবল থেকে মুক্ত নয়। ষাট-এর দশকে পশ্চিমা জগতেই এর বিচরণ হলেও গত বিশ বছরে এর পরিসীমা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্পন্নোত দেশগুলিতে পশ্চিমা দেশ থেকে অবাধে এই মাদকদ্রব্যসমূহ এসে সমাজের প্রতিটি স্তরে বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে আমাদের সমাজের একটি বিরাট অংশ মাদকাসক্ত এবং এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ না গড়ে তুলতে পারলে সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম প্রতিহত করে দেবে।

এ বিষয়ে আলোচনা প্রারম্ভিকে 'মাদক' শব্দটির অর্থ জানা প্রয়োজন। সোজা ভাষায় এটি এমন এক বস্তু যা কোন মানুষকে আসক্ত ও নির্ভর করে তোলে এবং এর বিকল্প পাওয়া যায় না। যদিও এর অনেকগুলোই জীবন রক্ষাকারী ওষুধের সাথে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় আমরা গ্রহণ করে থাকি। আসক্তি তখনই শুরু হয় যখন পৌণঃপুনিক ব্যবহার ছাড়া অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং ব্যবহারকারী তা সেবনে বাধ্য হয়ে পড়ে। কারণ না ব্যবহার করলে তাদের স্নায়ুতন্ত্রে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

যেহেতু বাংলাদেশ ড্রাগস উৎপাদনকারী দেশ নয় তাই বাংলাদেশের জন্য এর প্রসার তথা দেশে প্রবেশই মূল সমস্যা। বাংলাদেশে এক সময় গাঁজার চাষ হলেও ১৯৮৯ সাল থেকে তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সমষ্টিগত স্বার্থে সরকার বড় রকমের রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হলেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এটা এক প্রশংসনীয় উদাহরণ।

GOLDEN TRIANGLE (মায়ানমার, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড) এবং GOLDEN CRESCENT (পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান) এর মাঝে অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ মাদক ব্যবসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট কেন্দ্র। মায়ানমার ও বাংলাদেশের সীমান্তে সমুদ্র দিয়ে অবাধে ড্রাগস দেশে প্রবেশ করেছে। উন্নত প্রযুক্তির অভাবে সমুদ্র ও বিমান বন্দরে কার্যকরীভাবে এর দমন ও সনাক্তকরণও সম্ভব হচ্ছে না। ভারত, নেপাল, ভূটান প্রতিবেশী অঞ্চল GOLDEN WAYS থেকে আশংকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে- যেটা এখন থেকেই অনুধাবন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে অতীতে এ সমস্যা এত মারাত্মক ছিল না। ধর্মীয় ও পারিবারিক কারণে এর ব্যবহার ছিলো সীমিত। আটককৃত নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের পরিমাণ থেকে জানতে পারা যায় যে এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ঢাকায় আনুমানিক এক লক্ষের অধিক মাদকাসক্ত রয়েছে। যা শুধু শহরে বা পুরুষ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়- বরং

গ্রাম অঞ্চল ও মহিলাদের মধ্যেও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে আশংকাজনকভাবে। মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে জনগণের মধ্যে এর বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা। গণমাধ্যমগুলির সুষ্ঠু ব্যবহার এই বিষয়ে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। যদিও এ সমস্যা সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে তবু নিম্ন স্তরের লোকেরাই এতে সর্বাধিক আসক্ত এবং যেহেতু তারা অশিক্ষিত তাই তাদের পক্ষে এর কুফল সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়না। ফলে নিজের অজান্তেই তারা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। আর সেক্ষেত্রেই এটা সর্বনাশের মূল উৎস।

সাধারণ মানুষদের সচেতন করে তুলতে রেডিও ও টিভির মাধ্যমে প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে। এ ছাড়াও মাদকবিরোধী পত্রিকা, সাময়িকী প্রকাশ করে ও সভা সমিতির আয়োজন করছে সরকারী দপ্তর ও নানান বেসরকারী সংস্থা। এ বিষয়ে এনজিও (Non Governmental Organisation) সমূহের তৎপরতা উল্লেখ্য। এরা আগেও প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও আশা করা যায় এর ব্যতিক্রম হবে না।

১৯৯০ সালে জাতিসংঘ মাদক বিরোধী দশক পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও এর সাথে একাত্মতা ঘোষনা করে। তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এ উপলক্ষে একটি স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সচেতন ব্যক্তিরা একে প্রতিহত করতে একত্রিত হলেই আমরা এ ভয়াবহ সমস্যার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তি আনতে পারবো। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ এ দশকের মধ্যেই সমাজকে এ কালব্যাধি থেকে নীরোগ করা।

আরেক পদ্ধতিতে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তা হলো আইন প্রয়োগের মধ্যমে। কিন্তু প্রয়োজনীয় জনবল, সরঞ্জাম, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে এর কার্যকরী ব্যবহার আমাদের দেশে আশানুরূপভাবে হচ্ছে না।

আজ আমরা এমন এক অবস্থার মুখামুখি যা আমাদের মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ কালব্যাধি দেশকাল বিচার করে না, সমাজের সকল স্তরে এর অবাধ যাতায়াত। এর বিরুদ্ধে এখনই আমাদের অভিযান শুরু করতে হবে এবং তা হতে হবে সামগ্রিক সমন্বয়ের মাধ্যমে।

এ প্রসঙ্গে আরও অন্যান্য সংগঠনের সমন্বয়ে আহছানিয়া মিশনের কার্যক্রম অত্যন্ত আশাপ্রদ। তারা জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি কল্পে নানা কাজ করছে যার মধ্যে রয়েছে মাদকতা বিরোধী র‌্যালী, মাদকতা বিরোধী আলোচনা সভা, বিতর্ক অনুষ্ঠান, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে বেশ কিছু মাঠকর্মী সৃষ্টি হয়েছে - যারা নিবেদিত প্রাণ হিসেবে এই কল্যাণকর ভূমিকায় অনুকরণীয় স্বাক্ষর রাখতে পারবেন।

যতই দিন যাচ্ছে মাদক প্রতিহত করা আরও কঠিন হয়ে উঠছে। মাদক চোরাচালানিরা সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং এর ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিরোধ গড়ে তোলার এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। তবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন যেন শুধু কাগজে কলমে তা সীমাবদ্ধ না থেকে সত্যিকারভাবে উপদ্রুত অঞ্চলে যথার্থ প্রায়োগিক কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন হয়।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ যেমন বলেছেন যে, "সমাজ বাগাড়ম্বরে তৃপ্ত নহে, সমাজ চায় কার্যকরী দৃষ্টান্ত, নতুন জীবন, নতুন প্রেরণা, নতুন জাগরণ।" ঠিক সেই একই কথা এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমাজকর্মীরা এ বিষয়ে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে আজকের বিক্ষুব্ধ মাজকে পরিণত করবেন প্রগতির জন্য শান্তির প্রচেষ্টায়। আর এ জন্য চাই আন্তরিকতায় নিবেদিত কর্মী ও তাদের অনুসৃত মঙ্গলময় নীতির বাস্তবায়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ। এখানে উল্লেখ্য বাংলাদেশে বিগত দশকে যে সচেতনতার উদ্রেক হয়েছে তার বিকাশ হয়ত আশানুরূপভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। তার কারণ বহুবিধ। মূলতঃ অন্যতম প্রধান অন্তরায় হচ্ছে সাধারন জনগণের অনীহা থেকে সৃষ্ট এক পরিবেশ সেখানে ভাল কিছু করলে যার যা প্রাপ্য তা না দিয়ে বরং খাটো করে দেখা হয়। একথার মানে এই নয় যে, কাজের প্রশস্তির জন্য শুধু কাজ করা হবে। এটা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, কোন ভালো জিনিসকে সাদরে গ্রহণ করে তার প্রশংসা করলে সেটা অন্যের কাছে উদাহরণ স্বরূপ হতে পারে। এবং পরবর্তীতে তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতামূলক শুভ প্রবণতার সৃষ্টি হয় সেটা সমাজের দুষ্ট ক্ষত সারানোর জন্য একান্তভাবেই কাম্য।

আর এই প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশ সরকার তাঁদের নিজ কর্মসূচির সঙ্গে সংযোজন করেছেন অসংখ্য এনজিওদের সক্রিয় ভূমিকা। জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষজ্ঞের পরামর্শে আর্থিক সহযোগিতা। এ প্রসঙ্গে UNDCP, UNFDAC, WHO প্রভৃতি সংগঠনের সমন্বিত প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। একাধিকভাবে এই অশনিসংকেত দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন উপায়ে গবেষণাও তার প্রায়োগিক ক্রিয়া কর্ম ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্নভবে তুলে ধরা হচ্ছে। আমাদের এখানেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে UNDCP পরিস্থিতি সরোজমিনে পরিদর্শন করে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশমালার ভিত্তিতে প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করছে। ভিয়েনায় অবস্থিত সদর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় শীঘ্রই বাংলাদেশে বড় ধরনের এই প্রকল্পের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। সরকার এ প্রচেষ্টায় যথাশীঘ্র আগ্রহ প্রকাশ করে কর্মসূচি তরান্বিত করবেন বলে আমরা আশাবাদী।

শুধু অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে না থেকে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে আমাদের আরও যত্নবান ও সজাগ হতে হবে। বিশেষ করে প্রত্যেকটি অভিভাবককে, যেন তাদের ছেলেমেয়েরা এই দুঃসহ পরিস্থিতির শিকার না হয়।

ছেলে-মেয়ের আচার-আচরণে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা গেলে অভিভাবক, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-গুরুজন, চিকিৎসক এবং হিতৈষীদের খেয়াল রাখতে হবে যেন এই ধরণের উপসর্গগুলো সম্বন্ধে সচেতন থেকে সংশোধনের পথে আসার জন্য মনোনিবেশ করা হয়। অনেক কিছুর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়ঃ

১. মনমানসিকতার আকস্মিক পরিবর্তন হওয়া
২. হঠাৎ নতুন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে চলাফেরা করা
৩. বিভিন্ন অজুহাতে ঘন ঘন টাকা চাওয়া
৪. অসময়ে বিলম্বে বাসায় ফেরা

৫. রাতে জেগে থেকে দিনে ঘুমানো
৬. ঘুম থেকে জাগার পর অস্বাভাবিক আচরণ করা
৭. খাওয়া দাওয়ায় অনীহা ও ওজন কমে যাওয়া
৮. বই-পত্র ম্যাগাজিন পড়ার বাহানায় দীর্ঘ সময় টয়লেটে কাটানো
৯. অকারণে বিরক্তির প্রকাশ ও অযাচিত ভাব দেখানো
১০. তার কামরায় সিগারেটের তামাক, কাগজের পুরিয়া, প্লাষ্টিক বোতল, খালি শিশি, দিয়াশলাই ও পোড়ানো কাঠি, ইনজেকশন সিরিঞ্জ বা অন্যান্য সাধারণভাবে ব্যবহারযোগ্য নয় এ ধরণের আলামত দেখা যায়।

এগুলো থাকলেই যে মাদকাসক্ত হয়েছে তা ধারনা করা ঠিক না হলেও এই অবস্থায় আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অধিকতর সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

পৃথিবীব্যাপী মাদক বিরোধী আন্দোলন এত ব্যাপকভাবে তোড়জোড়ের সাথে শুরু হয়েছে যে দেশের বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই ক্রমবর্ধমান অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য বরাদ্দ করা হচ্ছে। একথা বলা আর অত্যুক্তি হবে না যে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রধান সমস্যা হোল মাদকাসক্তি, মাদকদ্রব্য চোরাচালান এবং এর জন্য চাই সত্যিকারের প্রতিরোধের অঙ্গীকার ও আন্তরিক প্রতিরোধ। বিভিন্ন সভা-সমিতি সেমিনার সিম্পোজিয়াম, আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, স্লাইড-পোস্টার, ষ্টিকার-ষ্ট্যাম্প সবকিছুরই নিজস্ব শুভ প্রতিক্রিয়া আছে এবং তা অর্জন করা সম্ভব যদি আমরা যা জানি না-তা জানার চেষ্টা করি, যা জানি-তা বুঝে চলার চেষ্টা করি-যা করণীয় তা শুধু অন্যকে উপদেশ না দিয়ে নিজে পালন করি এবং অন্যের সমালোচনা করার আগে যদি-নিজের ঘর সামলানোর জন্য আত্মসমালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেই। উল্লেখ না করে পারছি না যে অনেক সমাজকর্মী বিভিন্ন স্তরে দিনভর বক্তৃতা করে ঘরে ফিরে দেখেন রাত্রে তার স্নেহের পাত্র-পাত্রীর খোঁজ নেই-বা থাকলেও অশোভন ও অসঙ্গত সংশ্রবে আছে তাহলে তো গোড়ায় গলদ রয়েই গেল। তাই প্রয়োজন আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাণীর আলোকে নিজের হাতে নিজের ভবিষ্যত নষ্ট না করে প্রথমেই মাদকমুক্ত নিজ পরিবার, পরে প্রতিবেশী, তারপরে সমাজ, দেশ, অঞ্চল গঠন এবং তাহলেই আস্তে আস্তে পাওয়া যাবে আরাধ্য মাদকমুক্ত পৃথিবী।

আসুন আমরা সবাই এই মুহূর্ত থেকেই মনে মনে প্রত্যেকে আরও আন্তরিক হই যেন আমাদের কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে সুষ্ঠ কর্মসূচি দ্বারা অন্যকে প্রভাবান্বিত করে, মাদকজনিত অশুভ লক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে উঠে এই আন্তর্জাতিক মাদকমুক্ত দিবস ২৬শে জুনের যথার্থতা প্রমাণে সম্ভবমত সর্বশক্তি নিয়োগ করে ভবিষ্যতের প্রজন্মদের জন্য তুলনামূলকভাবে ভাল সমাজ ব্যবস্থা উপহার দিতে পারি। যেন কৈফিয়তের বদলে পাই প্রশস্তি-আর তা হলেই আসবে কাঙ্খিত সেই শুভদিন - অপরাধবিহীন সমাজ ও প্রগতির জন্য শান্তির আদর্শ পরিবেশ।

লেখক প্রাক্তন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, প্রাক্তন মহাপরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট আমিক কেন্দ্রীয় কমিটি।

মাদক সমস্যা নিরসনে আন্তর্জাতিক সহায়তা

মোঃ রশিদুল হক

একবিংশশতাব্দীর সূচনালগ্নে দাঁড়িয়েও পৃথিবী আজ মাদকের ভয়াবহ দংশনে জর্জরিত। মাদকের ছোবলে ঝরে যাচ্ছে বহু তাজা প্রাণ। অংকুরেই বিনষ্ট হচ্ছে বহু তরুণের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষৎ। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা ও অসঙ্গতি। বিঘ্নিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তাই বর্তমান পৃথিবী ও মানবসভ্যতার প্রতি মাদকদ্রব্য একটি বিরাট হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান বিশ্বে মাদক সমস্যা শুধু মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল বা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; এর বিস্তৃতি হয়েছে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে। বর্তমানে মাদকের অপব্যবহার ও এর অবৈধ চোরাচালান একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং এর সমাধানে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার।

আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশে "মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬শে জুন অতীব গুরুত্বসহকারে উদযাপন করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা, এর অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মাদকবিরোধী একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাই দিবসটি পালনের মূল লক্ষ্য। উক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে বর্ণাঢ্য পদ শোভাযাত্রা, সাইকেল র‍্যালী, বেতার-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার, পোষ্টার, স্টীকার বিতরণ ইত্যাদি ব্যাপক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগেও দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও জনাধিক্য ইত্যাদি সমস্যার সাথে মাদকদ্রব্য অপব্যবহারজনিত সমস্যা যুক্ত হয়ে এ দেশের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সৃষ্টি করেছে এক মারাত্মক বিশৃঙ্খলা। নৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের হয়েছে ব্যাপক অবক্ষয়। আমাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বিশেষ করে এর পূর্বে 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল' (মায়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড) এবং পশ্চিমে "গোল্ডেন ক্রিসেন্ট" (পাকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তান) নামক পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দুটি আফিম উৎপাদক এলাকা অবস্থিত হওয়ায় মাদকের সহজলভ্যতা এবং মাদক অপব্যবহারজনিত সমস্যা দ্রুত বিস্তার লাভ করছে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, অবৈধ পাচার এবং মাদকাসক্তির অভিশাপে মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রা রুদ্ধ প্রায়। কোন দেশের একক প্রচেষ্টায় এ মারাত্মক সমস্যাকে প্রতিহত করা কোনভাবেই সম্ভবপর নয়। তাই দ্রুত সম্প্রসারিত এ সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে

মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা রোধে সমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে মাদকদ্রব্যের অবৈধ পাচার রোধে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার অবৈধ মাদকদ্রব্যের চোরাচালান এবং অপব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে প্রণয়ন করেছে নারকোটিকস কন্ট্রোল এ্যাক্ট- ১৯৯০ এবং এ আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠা করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং গঠন করেছে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মাদক-দ্রব্যের ভয়াবহতা রোধে বাংলাদেশ জাতিসংঘের মাদকবিরোধী কনভেনশন ১৯৬১, ১৯৭১ ও ১৯৮৮ এবং সার্ক কনভেনশন অফ নারকোটিকস ড্রাগস অন সাইকোট্রোপিক সাবসটেন্স ১৯৯০ স্বাক্ষর করেছে এবং সকল কনভেনশনের আলোকে আইনগত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত কারিগরী সহায়তামূলক চুক্তির মাধ্যমে সমাজে মাদক বিরোধী কর্মকাণ্ড জোরদার করার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যোগাযোগ সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম অনুদান হিসেবে লাভ করেছে। মাদক চোরাচালান রোধ কল্পে মায়ানমার ও ইরানের সাথে যথাক্রমে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং চুক্তি অনুযায়ী মাদক সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য এ সকল দেশের সাথে বিনিময় করা হচ্ছে। ভারত এবং থাইল্যাণ্ডের সাথে অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষরের আলোচনা চলছে।

দেশের অভ্যন্তরে, আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মাদকবিরোধী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জাতিসংঘের মাদক বিরোধী সংস্থা ইউএনডিসিপি, আইএনসিবি, সিএনডি, কলম্বো প্ল্যান সেক্রেটারিয়েট, আইএলও, এসকাপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ডি. ই. এর ন্যায় বিভিন্ন সংস্থার সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। ইউ. এন. ডি.সি.পি-র আর্থিক সহায়তায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর একটি পাঁচ বছর মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যেটি জুন/২০০০তে সমাপ্ত হয়েছে। ইউএনডিসিপির আর্থিক সহায়তায় আরো একটি চার বছর মেয়াদী আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে নতুন প্রকল্প শুরু করার বিষয়ে সরকার কর্তৃক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আশাকরা যায় যে, আন্তর্জাতিক সহায়তায় এ সকল প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন এবং মাদক বিরোধী কার্যক্রমে সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে দেশে মাদক সমস্যা নিরসনে চলমান উদ্যোগ আরো অনেক বেশী কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে।

একথা অনস্বীকার্য যে, সরকারের একক প্রচেষ্টায় মাদক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বেসরকারি পর্যায়ের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা। এর পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-চিকিৎসক-সমাজকর্মী-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ আপামর জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। গড়ে তুলতে হবে মাদক বিরোধী সামাজিক আন্দোলন।

লেখক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) এবং সদস্য আমিক কেন্দ্রীয় কমিটি।

Drug Abuse & Families

Dr. Shamim Matin Chowdhury

It is common knowledge that drug abuse can cause enormous damage to individuals. Compulsive and uncontrolled drug use erodes moral, social and religious values. it can also cause physical and mental damage, premature death and loss of productivity. The impact of these changes in the drug abuser affect not only drug abuser himself but also the society at large and most directly the family. The families of drug abusers don't always face the same problems; however, my work at the treatment center has helped me to identify some common problems faced by the families. Most families of drug dependent people share the following difficulties.

Initial Reaction

Upon first discovering drug abuse, the family's reaction toward the abuser is usually one of anger and threats. Sometimes this is accompanied by physical assault and locking the person in the room. At the same time, there is often a member in the family who adopts a sympathetic approach towards the drug abuser. For example, the mother or the spouse or a sibling who may quietly continue to support the abuser by protecting him and giving him financial assistance.

Family Relationship Deteriorates

With money stolen from home, articles sold, lying and cheating trust is completely lost. With promises repeatedly broken the family unit becomes unstable and members of the family lose hope. They adopt a "what is the use" attitude and the communication between the drug user and the family breaks down. The drug abuser may become hostile and aggressive, often striking out those with whom he had the closest relationships. In most cases it is the mother or the spouse. In an effort to force a change in the drug addict the family uses the "if you love us" approach; playing

upon feelings of guilt. If the addict is married the spouse withdraws from sexual contact and later there is separation leading to divorce.

The family relationship which may have been warm and closely knit before becomes hostile, aggressive and anxious with little or no communication between members. If the drug abuser is a parent the children may be left with more responsibility for managing the home.

High Levels of Family Conflict

There is amazingly high degrees of daily conflict in the family. "family war" appears to be a daily event. The drug abuser threatens, throws things and hits to get money. Often parents start quarreling over the addict. Also, other children of the family revolt and become unwilling to continue living in the existing pattern in the family.

Loss of Family Discipline

Gradually there is a lack of family discipline as the drug abuser removes himself from family activities. He stops sharing family's concerns. his living pattern changes such as he arrives late at night and sleeps late and abstains from work or school. he is never there to eat meals together or run errands for the family.

Family Respect Damaged

Loss of job due to irregularity, truancy or drop out from school, borrowing money from relatives, neighbors and other people, involvement in street crimes resulting in involvement with the police and jail, bad sexual behaviour damages the family's respect.

Social Insolation/Community rejection

As a result of these unacceptable behaviors the family develops a protective boundary. They stop interacting with neighbours and relative and avoid social gatherings. The community also rejects the family of the drug abuser and often it becomes difficult for the family to get their other children into jobs or get them married off.

Mental Stress of the Family

The family members feel responsible and experience strong feelings of failure, frustration and inadequacy.

Financial Difficulties

Most families face financial difficulties due to either loss of job of the drug abuser or diversion of family income. The drug abuser ceases to contribute financially to his family because he needs all the money to buy his drugs.

Ill Health of Family Member

Due to insufficient resources for food and other physical needs family members suffer from ill health.

Mental Trauma for Children

Marital violence, separation and divorce, hostility and aggressiveness cause mental trauma to children leading to learning difficulty, hyper activity and difficult temperament.

Health hazards

The drug abuser is prone to many infections and sexually transmitted diseases due to lowered resistance. Family members and also prone to be infected with such diseases as they live in the same environment.

Drug abusing behavior is often passed on to other family members. For example, children or younger siblings may copy the drug abuser.

In conclusion, I would like to add that although a drug addict may inflict a lot of trouble to the family, it is important to bear in mind that a lot of times disruptive, negligent, undisciplined and ineffective family may be the cause of the addiction in a family member.

Writer is the Chief Consultant, Central Drug Addiction Treatment Center Dhaka & Member AMIK Central Committee.

"স্বাস্থ্য ব্যবস্থাঃ তামাক মুক্ত বিশ্বের জানালা"

ডাঃ এম.এ.হাই

প্রতিবছর ৩১শে মে, সারা বিশ্বব্যাপী পালিত হয় "বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস"। ধূমপান তথা তামাকের অপকারিতা সম্পর্কে নতুন করে সজাগ করে তুলে ধুমপান থেকে বিরত থাকার আহবান জানানো এবং দেশে দেশে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, সমাজ কর্মীবৃন্দকে তামাকমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাই এই দিবসটি পালনের মূল লক্ষ্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিরাজমান পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে এক এক বছর এক একটি শ্লোগান নিধারণ করে এবং পরে সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে তোলা হয়। বিগত বছরে একটি স্লোগান ছিল "স্বাস্থ্য ব্যবস্থাঃ তামাকমুক্ত বিশ্বের জানালা"।

তামাকের ধোঁয়ায় প্রায় চার হাজার রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। এর মধ্যে ক্যান্সার সৃষ্টিতে সক্ষম রাসায়নিক পদার্থের সংখ্যাই প্রায় ৩০০টি। আসক্তি সৃষ্টিকারী যত রকমের পদার্থের কথা জানা যায় তার মধ্যে সব চাইতে বেশী আসক্তি সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থটি হচ্ছে নিকোটিন যা এই তামাকের ধোঁয়ায় বিদ্যমান।

আসক্তি ও তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াও যে সমস্ত রোগ ব্যধি ধূমপান বা তামাকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা হলঃ ফুসফুসের ক্যান্সার স্বরযন্ত্রের ক্যান্সার, মুখ গহ্বরের (অর্থাৎ গালের ভিতরের দিকের, জিহ্বার, মাড়ির, টনসিলের, গলবিলের) ক্যান্সার, ইসোফেগাস বা অন্ননালীর ক্যান্সার, অগ্নাশয়ের ক্যান্সার, কিডনী ও মূত্রথলির ক্যান্সার ও জরায়ু মুখের ক্যান্সার।

হৃদরোগ, ষ্ট্রোক এবং হাত-পা প্রভৃতি শরীরের প্রত্যন্ত এলাকার রক্তনালীর রোগের সঙ্গে ধূমপানের নিকট সম্পর্ক রয়েছে। এ্যাজমা, ক্রনিক ব্রংকাইটিস ও এমফাইসিমার সঙ্গেও তামাকের সম্পর্ক রয়েছে। গর্ভধারণের কতগুলো জটিলতা অর্থাৎ গর্ভপাত, কম ওজনের বাচ্চা প্রসব, নবজাতকের মৃত্যু, বিকলাঙ্গ শিশু জন্মের সংগেও তামাক ও ধূমপান জড়িত।

পেপটিক আলসার, মুখের ঘা, সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা, অস্থিনালী ও শ্বাসনালীর সংক্রমনের সঙ্গেও তামাকের সম্পর্ক রয়েছে।

যে লোক নিজে ধূমপান করেন না তারও হৃদরোগ হতে পারে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস ও এ্যাজমা হতে পারে, যদি তার চারপাশের মানুষ ধূমপান করে এমন কি অধূমপায়ী মহিলা অল্প ওজনের বাচ্চারও জন্ম দিতে পারেন-যা পরিনতিতে শিশু মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসে।

আর, এই রোগ ব্যাধির পথ ধরেই প্রতি বছর প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক তামাক জনিত রোগের কারণে মৃত্যু বরণ করছে। যে দেশের লোক সংখ্যা আমাদের প্রায় অর্ধেক- সেই যুক্তরাজ্যে তামাক জনিত ব্যাধির মোকাবেলায় প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। আমাদের দেশে যুক্ত রাজ্যের প্রায় দ্বিগুণ লোকসংখ্যায় তাহলে তামাক জনিত কারণে মৃত্যুর

সংখ্যা কত? কত টাকাই বা তাহলে প্রয়োজন তামাক জনিত রোগ-ব্যাধি মোকাবেলার জন্য ? সংগত কারণেই তাই, তামাকবিহীন বিশ্বের আকাঙ্খা করছে মানুষ।

জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢোকে আলো, ঢোকে বাতাস। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে আসে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী ও সঠিক দিক নির্দেশনা। একজন রোগী বা একটি পরিবার যতবার পরামর্শের জন্য ডাক্তারের কাছে আসে, যতবার রোগ চিকিৎসায় ডাক্তারের বা হাসপাতালের শরণাপন্ন হয় ততবারই তামাকের বিষময় প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য ধূমপান ত্যাগে পরামর্শ দেবার সুযোগ ঘটে, সুযোগ সৃষ্টি হয় সেই কিশোর-তরুণ ও যুবককে জীবনে কোনদিন ধূমপানে আসক্ত না হবার পরামর্শ দেবার যে এখনও ধূমপান শুরু করে নাই। তাই ডাক্তার, মেডিকেল ছাত্র, নার্স, ফার্মাসিষ্ট-যারা চিকিৎসাকেন্দ্র বা হাসপাতালের প্রতিবিম্ব তাদেরকে এ ব্যাপারে তাদের নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই এ বারের শ্লোগানের উদ্দেশ্য।

তামাক বিহীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তামাক বিহীন বিশ্বের প্রথম শ্লোগান। আর তামাক বিহীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়তে হলে (১) ডাক্তার-নার্স-ফার্মাসিষ্ট-মেডিকেল ছাত্র ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, (২) হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডিসপেন্সারীগুলোকে ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, (৩) এ সমস্ত স্থানে তামাকজাত দ্রব্য যেমন, বিড়ি, সিগারেট, গুল, জর্দা বিক্রি নিষিদ্ধ করতে হবে, (৪) ধূমপায়ীকে ধূমপান ত্যাগের মুহূর্তে নৈতিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে হবে, তামাক নিয়ন্ত্রনে সঠিক নীতিমালা প্রণয়নে সাহায্য করতে হবে।

স্বাস্থ্য সার্ভিসের প্রাণ হচ্ছে চিকিৎসক। তাই ধূমপানমুক্ত স্বাস্থ্য সার্ভিস গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই চিকিৎসকদের কাছ থেকে এ ঘোষনা আসতে হবে যে, তাঁরা ধূমপান থেকে বিরত থাকবেন। কারণ, বাস্তবতা তো একথাই বলে যে, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিকিৎসকের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শকে রোগী ও রোগীর "দৈববাণীর" মতই মনে করে। আবার, তার চাইতেও কঠোর বাস্তবতা হলো এই যে, মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে কোন চিকিৎসক যদি মদ না খাবার পরামর্শ দেন তবে সে পরামর্শ কার্যকরী হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই, ডাক্তারদেরকেই প্রথম ধূমপান থেকে বিরত হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা। প্রতি বছর আমাদের দেশে সরকারী ও বেসরকারী মেডিকেল কলেজে প্রায় দেড়হাজার ছাত্র-ছাত্রী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হচ্ছে। এরাই আগামী দিনের চিকিৎসক। এঁরা আবার সেই বয়সের- যে বয়সে মানুষ ধূমপান শুরু করে। এঁদেরকে ধূমপানে বিরত রাখা ধূমপানমুক্ত স্বাস্থ্য সার্ভিস গড়ে তোলার অপরিহার্য বিষয়। তাদেরকে ধূমপান থেকে বিরত রাখার সবচাইতে কার্যকরী কৌশল হল অধূমপায়ী শিক্ষক দিয়ে ধূমপানের মারাত্মক কুফল সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই নবীন শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল করে তোলা। তাই কি ক্লাশে আর কি ওয়ার্ডে যে সমস্ত ডাক্তার মেডিকেল ছাত্রদের শিক্ষন ও প্রশিক্ষণের কাজে জড়িত

থাকবেন তাদেরকে অবশ্যই অধূমপায়ী হতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, পিতার চরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্যই সন্তানের অজান্তেই সন্তানের চরিত্রে সন্নিবেশিত হয়ে যায়। তেমনি শিক্ষকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর অজান্তেই শিক্ষার্থীর চরিত্রে চলে আসে।

হাসপাতালগুলোকে ধূমপানমুক্ত করা কি সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব যদিও তা খুব সহজ নয়। বিশ্বের যে ক'টি হাসপাতালকে এ পর্যন্ত ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে, সব খানেই তা করতে লেগেছে কয়েক বছর। জন হপকিন্সে লেগেছে দু'বছর, ওন্টারিওর ২১টি হাসপাতালকে ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে সময় লেগেলে প্রায় ৫-৬ বছর। একই সময় লেগেছে নরওয়ের আখেরশাস কাউন্টি হাসপাতালকে ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে সরকারী ঘোষনা দিতে। কিন্তু আমরা বাংলাদেশে এখনও শুরুই করলাম না। পর্যায়ক্রমে আমরাও হাসপাতালগুলোকে ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো। প্রথম পর্যায়ে এবছর আমরা আমাদের হাসপাতালের ডাক্তার নার্সসহ সকল কর্মচারী কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে জানতে চাইবো তাঁরা নিজ হাসপাতালকে ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা দিতে চান কিনা এবং সে ঘোষণা কার্যকরী করতে পূর্ণ সমর্থন দেবেন কিনা। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা ডাক্তার ও হাসপাতালের অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা অন্ততঃ রোগীদের সামনে ধূমপান থেকে বিরত থাকার আন্তরিক ঘোষণা দেব। তৃতীয় পর্যায়ে ২/১টি স্থান ছাড়া পুরো হাসপাতালে ডাক্তার, কর্মকর্তা-কর্মচারী, রোগী ও অন্যান্য বহিরাগতদের জন্য ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষনা করা। শেষ পর্যায়ে হাসপাতালের সমস্ত এলাকায় ধূমপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করবো।

এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে। বিশ্বের ৬৭টি দেশে হাসপাতাল ও চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানেই ধূমপান নিরোধ আইন প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং দূরের দেশ থাইল্যান্ড ও রয়েছে। কিন্তু আমার জানা মতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে এ ধরণের কোন আইন চালু করা হয়নি। আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও সকল সংসদ সদস্যের কাছে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাই।

ধূমপায়ীদের শাস্তি

বৃটেনের টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের অধীনে ১১৫০০ লোক কাজ করেন। এদের মধ্যে যারা ধূমপান করেন, তারা ধূমপান করতে দিনে প্রায় ৩০ মিনিট সময় নষ্ট করেন। তা বৎসরে ৩টি পুরো কাজের দিনের সমান। আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ ধূমপায়ীদের সপ্তাহে আড়াই ঘন্টা সময় অতিরিক্ত কাজ করতে হবে অধূমপায়ীদের তুলনায়। অর্থাৎ দৈনিক আধা ঘন্টা অতিরিক্ত কাজ করতে হবে; ধূমপান করে সময় নষ্ট করার শাস্তি হিসাবে।

লেখক আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের প্রকল্প পরিচালক এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি।

মাদকের অপব্যবহার ও আমাদের সমাজ

ডঃ আবদুল হাকিম সরকার

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও মাদকের অপব্যবহার আর এর অবৈধ পাচার-সংক্রান্ত সমস্যা আজ আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। সনাতন ভেষজ মাদকের ব্যবহার অপব্যবহারের ইতিহাস আবহমানকালের। রোগ নিরাময়ে বিশেষতঃ দুঃখ কষ্ট লাঘবে, ঐশ্বরিক সাধনায় ও কিছু ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এ সবের ব্যবহার আমাদের এই প্রাচীন সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। তবে এটি সকলেরই কমবেশি জানা যে, এসবের ব্যবহার সমাজের বহির্ভাগে নিম্নবেশী নিম্নবর্ণভূক্ত জনগোষ্ঠির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। সামাজিক দায়-দায়িত্বের দিক থেকে এসব জনগোষ্ঠির ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কমগুরুত্বপূর্ণ থাকার কারণে এ নিয়ে সচেতন মহলে তেমন কোন মাথাব্যাথা ছিল না। বিষয়টি অনেকটা এমন ছিল যে, সমাজে ভবঘুরে, জুয়াড়ী, পতিতা, ভিক্ষুক ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষ যেমন আছে তেমনি মাদকে আসক্ত, নেশায় অভ্যস্ত এরূপ কিছু মানুষ থাকবে।

তবুও উল্লেখ করা যায় যে, ব্যক্তিগত ও সমাজ দেহের উপর এ সবের সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাবের কথা চিন্তা করে ১৮৮৩ সালে এই উপমহাদেশে গাঁজা ব্যবহারের সুফল কুফল সম্পর্কে মতামত দেয়ার জন্য 'রয়েল ইন্ডিয়ান হেম্প কমিশন' নামে একটি অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালেও গাঁজা বা অন্যান্য নেশা চালু রাখার প্রমাণ উপমহাদেশের সামাজিক ইতিহাসে পাওয়া যায়।

যা হোক, আজ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা, উন্নত চিকিৎসা তথা সভ্য সমাজের দাবি পূরণের স্বার্থে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত মাদকদ্রব্যের যথা- ব্যবহারের সাথে কমবেশি অপব্যবহারের প্রবণতাও বেড়ে যায়। সত্যের সঙ্গে মিথ্যা, আসলের সঙ্গে নকল, 'আছে'র সঙ্গে 'নই' এর যেমন সংযোগ রয়েছে মাদকের অপব্যবহারের বিষয়টিও প্রায় তেমনি। আসল-নকল, আছে-নেই নিয়ে সমাজ জীবনে কমবেশি মাতামাতি থাকলেও 'সত্য-মিথ্যা' নিয়ে হয়তো তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। মিথ্যার আপাতঃ রূপ সত্যের মত না হলে সমাজে 'মিথ্যাচার' প্রবল হওয়ার কথা ছিল না। মাদকের অপপ্রয়োগে 'মিথ্যা' আছে। তবে এ মিথ্যা যারা এর 'শিকার' এদের দিক থেকে যতখানি না 'বড়' তার চেয়ে বেশি 'বড়' হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে যারা 'শিকারীর' ভূমিকায় সক্রিয়।

মাদক অপব্যবহারের মাত্রা ও পরিধি-এই সত্য-মিথ্যা আসল-নকল কুহেলিকায় আচ্ছন্ন অবস্থার মাঝেই দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে আর ব্যাপকতর হচ্ছে 'সমস্যা' আকারে। এ অবস্থা আজ আর 'রাস্তা' বা সমাজ-বহির্ভাগে সীমাবদ্ধ নেই; সমস্যা আকারে রীতিমত 'ঘরে' স্থান করে নিয়েছে। শ্রেণী সীমানা-অতিক্রম করে মাদকের অপব্যবহার ধর্ম, বর্ণ, বয়স ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকের দোরগোড়ায় পৌছে গেছে। চরম আশংকার কথা,

শিক্ষিত-সচেতন যুব-সমাজকেও এটি আজ গ্রাস করতে বসেছে। চারদিকে যুব-সমাজের মধ্যে যে ভাবাবেগ ও উশৃঙ্খল আচরণ লক্ষ্য করা যায় তাতে মনে হয় না যে তাদের জীবনে নির্দিষ্ট কোন 'সম্ভাব্য' বা 'গতি' আছে। এসব অবস্থার মাঝে দিন দিন যে 'সামাজিক দূরত্ব' তৈরী হচ্ছে তা' অচিরেই দল-সংঘাত, সমাজ-সংঘাতে রূপ নিতে বাধ্য। এসব অবস্থার আড়ালে সর্বক্ষেত্রে মাদকের অপব্যবহার সরাসরি দায়ী না হলেও একটি "বিভ্রান্তিমূলক কালচার" যে তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে এটা নিশ্চিত বলা যায়। এবং এ 'অবস্থার' মাঝে মাদকের সহজ প্রবেশ সম্ভব। উন্নত বিশ্বে ষাট সত্তর দশকে মাদকাসক্তির ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এ প্রসার আমাদের দেশে আশির দশক থেকে লক্ষ্যনীয় রূপ নেয়। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম হেরোইন-সেবী সনাক্ত করা হয়।

আমাদের সামনে এখন প্রশ্ন, এ ব্যাপ্তিশীল ও সমাজের রন্ধ্রে প্রবেশকারী এ সমস্যার স্বরূপ ও প্রকৃত ব্যাখ্যা কি সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া। ব্যাখ্যার এই কাজ সুকঠিন হলেও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোন থেকে মাদকাসক্তি সমস্যাকে সোশ্যাল, সাইকোলজিক্যাল ও মেডিক্যাল প্রেক্ষাপটে বুঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন- জ্ঞানীদের উক্তি, 'কোন মাদকাসক্তই মন্দ নয়, উন্মাদ নয়, একজন রুগীমাত্র', এটি একথাই প্রমাণ করে যে, এই জাতীয় সমস্যার মোকাবেলায় প্রচন্ড নাগরিক সচেতনতার সাথে সমাজকর্মী, মনোচিকিৎসক ও চিকিৎসকের সমন্বিত ভূমিকা রয়েছে। আরো উল্লেখযোগ্য যে, মাদকাসক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে অপরাধকর্মের যোগাযোগ সর্বজন স্বীকৃত। সনাতন দৃষ্টিতে মাদকাসক্ত 'প্যাথলোজিক্যাল' পর্যায়ভূক্ত হলেও মাদকে উৎকর্ষ বিধানের ফলে তারা আজ সমাজ-বিরোধী, অপরাধী হিসাবে দ্রুত বেড়ে উঠছে।

এসবের পেছনে সাধারণ করণ যা সমাজ বিজ্ঞানীরা (মার্টন ও নিসবেথ) মনে করেন তার কিছু এখানে উল্লেখের প্রয়াস পাচ্ছি। অবৈধ মাদক-ব্যবসায়ীচক্র ও তাদের অনুচর বাহিনী দুর্বল-চেতা মানবগোষ্ঠি বিশেষতঃ যুব-সম্প্রদায়ের হাতে 'দ্রব্য' তুলে দিচ্ছে। যেসব মানুষ অর্থনৈতিক-মনস্তাত্বিকভাবে অভিযোজন সমস্যায় আক্রান্ত, পরিবার সীমানায় জীবন-যুদ্ধে ব্যর্থ, হতাশ মানুষের মধ্যে যারা 'মুক্তি' অন্বেষন করে তাদের অনেকেই এর ভোক্তা আর পরিবেশ ও নিকট সঙ্গি-সাথীদের প্রভাবেও মাদকাসক্তি সমস্যা দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। আধুনিক বিশেষতঃ শহর সমাজে পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃংখলা, মূল্যবোধ-সংঘাত, বিচ্যুত আচরণ, সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দিক থেকে রাষ্ট্রীয় অভিভাবকত্বের অভাবে মাদকাসক্তের 'কেস' বা রুগীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে রুগদের কমবেশি দায়বদ্ধতা আছে বটে তবে দেশের ভৌগলিক ও সমাজ কাঠামোগত ভাবেও এ বিষয়ে অনুরূপ অনুসন্ধানের অবকাশ রাখে। জানা যায়, অবৈধ মাদক-ব্যবসা বা চোরাচালান বর্তমান সময়ে দ্রুত ধনী হওয়ার সহজতম পথ। মাদকদ্রব্য পাচারের বদৌলতে দেশে ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে অনেকেই হচ্ছে লক্ষ, কোটি ডলারের মালিক। বাজার পরিস্তিতি যাচাই, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষিপ্রতায় অনন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সংঘবদ্ধ এই অবৈধ পাচারকারীদের বৈধ ব্যবসার সঙ্গে এবং ক্ষেত্র

বিশেষে রাজনৈতিক সংগঠন এমনকি সমাজ সেবা সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা-কাঠামো তাদের অনুকূলে প্রভাবিত করা সম্ভব হচ্ছে। চোরাগুপ্তা আক্রমণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস পৃষ্ঠাপোষকতা ও পরিচালনায় এরা সিদ্ধহস্ত। নির্দিষ্ট এই অবৈধ মাদক-ব্যবসা ছাড়াও সমাজে সংঘটিত 'ভদ্রলোকের অপরাধকে' লক্ষ করে বলা হয়, মানুষ অপরাধ ঘৃণা করে ঠিকই, কিন্তু তাদের অনেকেই গোপনে অপরাধীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে।

এসব দ্বৈতাচারের 'করিডর' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। আজ ভারত ও পাকিস্তানের মাদকদ্রব্য বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এবং মায়ানমারের আফিম ও হেরোইন ভারত কিংবা বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাচার হচ্ছে। এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে মাদকদ্রব্যের হিংস্র থাবা এবং মাদকের নীলদংশনে বিপর্যস্ত হচ্ছে দেশের প্রাণশক্তি যুব সমাজ। এরূপ অবস্থায় (ভ্রান্তিপূর্ণ) বলা যায়, আপ্যায়ন-সামগ্রী হিসাবে মাদক, আপ্যায়নকারী হিসাবে অবৈধ ব্যবসায়ী ও আমন্ত্রিত খদ্দের হিসাবে যুব-সম্প্রদায় (বিশেষতঃ) এই তিনের সমন্বয়ে'মাদক-সমস্যা' জমজমাট রূপ নিয়েছে।

এসব পরিস্থিতির সার্বিক বিশ্লেষণে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে মাদক সমস্যাসহ আরো কতিপয় সামাজিক উপসর্গের প্রতি সমন্বিত মনযোগের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। সচেতন মহলে যে সামাজিক আন্দোলনের কথা বলা হয়, তার একটি কমন প্লাটফরম তৈরী হওয়া উচিত। জুয়া, মস্তানী, নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস, প্রতিতাবৃত্তি, ভবঘুরে, কিশোর-অপরাধ, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদির বিরুদ্ধেও সমভাবে সোচ্চার হওয়ার দিন এসেছে। সামাজিক প্রতিরোধ-প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা দরকার। অর্থাৎ সামাজিক আইনের আওতায় যে-সব সমস্যার বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ, কার্যকারিতা, ফলো-আপ এবং সোশ্যাল ও ক্রিমিন্যাল কাউন্টার ফেজে করণীয় সম্পর্কে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার জন্য কেন্দ্রিয়ভাবে 'সোশ্যাল ডিফেন্স এন্ড রিসোর্স কাউন্সিল', নামে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান তৈরী হতে পারে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'এ্যাকশন প্রজেক্ট' পরিচালনাসহ নিয়মিত গবেষণা-কর্ম চালু রেখে আইনের সামাজিক দিক ও তার প্রয়োগিক ক্ষেত্রে সমস্যা এবং পেশাগত বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এর উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক ও 'রিসোর্সের' ভিত্তিতে সরকারী নীতি নির্ধারণেরও এ প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এরূপ একটি 'হোলিষ্টিক এপ্রোচে' অগ্রসর হতে পারলে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ পেশাগত সম্পর্ক রচিত হবে যার ফল-শ্রুতিতে মাদকের অপব্যবহার, অবৈধ পাচারসহ অন্যান্য সামাজিক-মানবিক অপরাধের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলনের (সোশ্যাল এ্যাকশন) পটভূমি তৈরী হবে বলে আশা করা যায়।

লেখক- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এবং সদস্য আমিক কেন্দ্রীয় কমিটি

মাদকদ্রব্য বর্জনে যুব সমাজের ভূমিকা

এম. এহছানুর রহমান

১.০ প্রেক্ষাপট

১.১ মাদক গ্রহণ করা হলে কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হবার আগেই সেবনকারীর মৃত্যু হতে পারে। সাধারণত শ্বাসবদ্ধতা, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা এক্ষেত্রে বেশী।

১.২ মাদকদ্রব্য অপব্যবহারের কারণ

নেশাদ্রব্য ব্যবহারের কারণ এর ব্যবহারকারীদের মতই বহুবিধ এবং বিচিত্র। তবে যে কারণেই মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ঘটুক না কেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মাদকদ্রব্য গ্রহণ অত্যন্ত অন্যায় এবং ক্ষতিকর। মাদকের প্রতি কৌতুহল, নতুন অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়াস, বন্ধু বান্ধব এবং সঙ্গী সাথীদের প্রভাব, মাদকের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞতা, সহজ আনন্দ লাভের বাসনা, কৈশোর ও যৌবনের বিদ্রোহী ও বেপরোয়া মনোভাব, মনস্তাত্মিক পরিবেশ, প্রতিকুল পারিবারিক পরিবেশ, পারিবারিক পরিমন্ডলে মাদকের প্রভাব, মাদকের সহলভ্যতা, বেকারত্ব, হতাশা, একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতাবোধ, নৈতিক শিক্ষার অভাব ইত্যাদি বহুবিধ কারণ মাদকদ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

এখানে সঙ্গীসাথীদের প্রভাব এবং কৌতুহল এ'দুটি কারণের উপর আমি বিশেষভাবে জোর দিতে চাই। মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীরা সমাজের অন্যান্য লোকের মত তাদের সংগীদের কাছ থেকে তাদের আচরনের সমর্থন খোঁজে। আর তাই তারা গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য অন্যদের প্রায়ই তাদের নিজেদের বদভ্যাসটি গ্রহণ করতে প্ররোচিত করে। প্ররোচনায় সফল হবার জন্যে প্রথম প্রথম বিনা মূল্যে বা স্বল্পমূল্যে তারা মাদক যোগান দিয়ে থাকে এবং এটা কোন ক্ষতিকারক দ্রব্য নয় তা বুঝানোর চেষ্টা করে। প্রাথমিকভাবে পরীক্ষামূলকভাবেই মাদক গ্রহণের জন্য তারা উৎসাহিত করে। এ প্ররোচনার শিকার হয়ে অনেকেই প্রথমে একটা নিরীক্ষা হিসাবে মাদকদ্রব্য গ্রহণ শুরু করে। একজন লোক পরবর্তী পর্যায়ে নিয়মিত মাদকদ্রব্য সেবন করবে কিনা তা বহুলাংশে নির্ভর করে প্রথমবারের স্বাদ আর প্রথম ব্যবহারের ফলে ব্যবহারকারীর ওপর এর প্রভাবের ওপর। মাদকদ্রব্যটি যদি ঠিক সেই অনুভূতিটা দিতে পারে যা কিনা এর ব্যবহারকারী চাইছে, তাহলে এই মাদকদ্রব্য তাকে এর ক্রমাগত ব্যবহারে উৎসাহিত করে। যখন এর বিপদ সম্পর্কে সে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করে ততদিনে মাদকদ্রব্য সেবন ছেড়ে দেয়া বা তার যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা শুধরে নেয়ার সময় আর থাকেনা।

২.০ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

২.১ অপব্যবহার রোধ

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধ মাদক প্রতিরোধ কর্মসূচিকে সফল করতে অনেকাংশে সহায়তা করে। তিন ধরনের প্রচেষ্টা এ অপব্যবহার রোধে সহায়তা করতে পারে।

ক) সচেতনতা বৃদ্ধিঃ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের ঝুঁকি ও বিপদ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রবণতা কমাতে পারে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় মাদকসেবীদের মধ্যে ১৮-৩৫ বছর বয়স্ক যুব শ্রেণীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সকল সামাজিক স্তর, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের সদস্যদের মাদক অভ্যাসের মারাত্মক কুফল সম্পর্কে অবহিত করে এ কার্যক্রমকে সফল করা যেতে পারে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় শিক্ষা কর্মসূচি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যারা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করতে শুরু করেছে শিক্ষা তাদেরকে মাদক ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে এবং এটা ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। বাবা, মা ও শিক্ষকদের জন্যও এ সংক্রান্ত শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতে তারা সমস্যাটির স্বরূপ উপলব্দি করতে পারেন এবং কোন অবস্থায় কি করতে হবে সে সিদ্ধান্তটি দিতে পারেন।

খ) চাহিদা হ্রাসঃ স্বাভাবিকভাবেই মাদক গ্রহণকারী বা গ্রহণেচ্ছুদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাবে। কিন্তু কার্যকর চাহিদা হ্রাসের জন্য মাদকাসক্তির কারণসমূহের দূরীকরনে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহন না করলে মাদকের মোহ থেকে এর গ্রহণেচ্ছুকে দীর্ঘদিন সরিয়ে রাখা অনেকক্ষেত্রে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে চাহিদা সাময়িক হ্রাস পেলেও তা আবার বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

গ) সরবরাহ নিয়ন্ত্রণঃ বিশ্বব্যাপী মাদকদ্রব্যের অবৈধ সরবরাহ এর বর্তমান চাহিদার চেয়ে অনেক বেশী। তাই মাদক ব্যবসায়ীরা প্রতিনিয়ত এর নতুন ক্রেতা আর বাজার খুঁজছে। মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবসায়ে লিপ্ত হচ্ছে। একই সোথে মাদকদ্রব্যের গুণগত (রাসায়নিক) পরিবর্তন করে একে অপব্যবহার উপযোগী (তথাকথিত হালকা মাদক) করে তোলা হচ্ছে। ফলে দাম কমে গিয়ে ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে নেশা সৃষ্টিকারী মাদকদ্রব্যের ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত কাঁচামাল এবং সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের ব্যবহার কেবলমাত্র আইনগত চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

২.২ অবৈধ পাচার নিয়ন্ত্রণ

অবৈধ পাচার বলতে নিষিদ্ধ ঘোষিত সকল মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ অথবা সরবরাহকে বোঝানো হয়। এই পাচার চক্রের নেটওয়ার্ক এত বিস্তৃত যে, কোন দেশই এর ছোঁয়া থেকে মুক্ত নেই, সেই দেশ উৎপাদক, পাচারে ট্রানজিট অথবা বাজার যেটাই হোক না কেন। একদিকে যেমন এ অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তৎপরতা বাড়ছে, অন্যদিকে মাদক উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীরা নিত্যনতুন কৌশল ও রুট খুঁজে বের

করে নির্বিঘ্নে তাদের অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য বৈধ বাজার থেকে অবৈধ বাজারে নেশা সৃষ্টিকারী মাদকদ্রব্য এবং মানসিক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দ্রব্যের পাচার রোধে সকল স্তরে একটি কার্যকর ও দক্ষ মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকর আইনগত উদ্যোগ এবং সহযোগিতার পাশাপাশি ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা ছাড়া মাদকদ্রব্যের অবৈধ পাচারের মত অত্যাধুনিক জটিল প্রক্রিয়ার মোকাবেলা সম্ভব নয়।

৩.০ যুবসমাজের করণীয়

মাদকদ্রব্যের ব্যাপক অপব্যবহার মানব সভ্যতার জন্য এক ট্রাজেডির রূপ নিয়েছে এবং এর সরাসরি শিকার যুব সমাজ। ফলশ্রুতিতে পরিবারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মস্থলে সর্বত্র এক ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। মাদকসেবীরা তাদের অভ্যাস চরিতার্থ করার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য সংগ্রহের জন্য যে কোন অপরাধ করতে দ্বিধা করেনা। এজন্যই বলা হয়, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অপরাধ পাশাপাশি চলে। এ অবস্থা প্রতিরোধে যুবসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা প্রয়োজন।

ব্যক্তিপর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ

সঙ্গী-সাথীদের প্রভাবিত করার মাধ্যমে প্রত্যেক যুবক (এবং যুবতী) তার পরিচিতজনকে মাদকমুক্ত রাখার উদ্যোগ নিতে পারে। "আমরা যারা একসাথে চলি তারা কেউ মাদক সেবন করবো না" - এ প্রত্যয় যদি প্রতিটি যুবকের মধ্যে জাগে তাহলে উল্লেখযোগ্য পরিমান মাদক চাহিদা হ্রাস পাবে, অথবা অন্তত নতুন চাহিদা সৃষ্টি হবে না।

পারিবারিক পর্যায়ে

পরিবারে প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব রয়েছে অন্যদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা। পরিবারে কোন সদস্য মাদকাসক্ত হলে সাধারণত লজ্জা/বিব্রত অবস্থার কথা ভেবে বয়োজেষ্ঠ্যরা এ সমস্যার কথা স্বীকার করেন না বা এর মুখোমুখি হন না। এক্ষেত্রে পরিবারের যুব সদস্য বা মাদকাসক্তের পারিবারিক বন্ধু পর্যায়ের যুবকেরা সাহসিকতার সাথে এটা মোকাবিলা করতে পারে।

ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক উভয়ক্ষেত্রেই ভূমিকা হবে একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ের যোগাযোগ-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য এবং জীবনের অন্যক্ষেত্রে ঝুঁকি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে উপলব্ধি আনতে পারলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। একইভাবে, মাদকাসক্তের ত্বরিত চিকিৎসা, ফলোআপ ও পুনর্বাসনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

সামাজিক পর্যায়ে

সামাজিক পর্যায়ে একটি ব্যপক আন্দোলন সৃষ্টির ক্ষেত্রে একমাত্র যুবসমাজই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। কোন এলাকায় কি ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করলে ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব, তা সে এলাকায় বিদ্যমান সমস্যা এবং পরিস্থিতির উপর

নির্ভর করছে। তবে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাধারণত যে সকল কার্যক্রম স্থানীয়ভাবে যুবসমাজ গ্রহণ করতে পারে তা এখানে উল্লেখ করা হলঃ

- মাদকবিরোধী সংগঠন প্রতিষ্ঠা;
- মাদকবিরোধী পথসভা, র‍্যালী আয়োজন;
- মাদক সম্পর্কিত আলোচনা সভা, বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতা;
- ক্রীড়ানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহারের কুফল তুলে ধরা;
- পোষ্টার, ষ্টিকার, সংকলন ও স্থানীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের কুফল তুলে ধরা;
- একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে সম্পূর্ণ মাদকমুক্ত রাখার কার্যক্রম গ্রহণ;
- মাদকাসক্ত তরুনদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা;
- মাদকদ্রব্য চোরাচালান, বিক্রয়, বিতরনের ঘাটি উচ্ছেদ কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ;
- প্রতিজনে একজন মাদকসেবীকে মাদকসেবন থেকে বিরত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ।

৪.০ উপসংহার

মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীর ক্ষেত্রে প্রধান উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে অত্যন্ত উঁচুমানের সংগঠিত অপরাধ চক্র এবং মাদকদ্রব্যের খুচরো বিক্রেতা ও প্রান্তিক বিতরনকারীদের এই অপরাধ চক্রগুলোর সাথে যোগাযোগের মাত্রা।

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা রাস্তার মোড়ে যে ভবঘুরে লোকটি তার মাদকের মজুত থেকে যে কোন একটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য ছাত্রজনতাকে প্রলোভিত করছে, তাকে দেখে হঠাৎ করে এটা বোঝার উপায় নেই যে এই আপাতত সহজপ্রাপ্তির পেছনে কতটা গোপন সুসংবদ্ধ দল কাজ করছে। ব্যাপারটা ধরা পড়ে যদি এ সুত্র ধরে কোন বিপুল মাদকদ্রব্য আটক করা হয়। এ সুসংবদ্ধ নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ নিজেদের স্বার্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিংস্র হয়ে উঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে এরা অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিতও থাকে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক সহযোগিতা ছাড়া কার্যকর চোরাচালান রোধ সত্যিই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্য যুব সমাজেকে তাদের ভূমিকা পালনের জন্য একদিকে যেমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে অন্যদিকে একে কার্যকর করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহযোগিতা অপরিহার্য। একই সাথে, পুরো সমস্যাটিকে সামাজিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতাও অপরিহার্য। এককভাবে কোন সরকার বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এর মোকাবিলা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন।

লেখক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মসূচি বিভাগের পরিচালক এবং সদস্য আমিক কেন্দ্রীয় কমিটি।

স্থানীয় পর্যায়ে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন

খন্দকার জাকিউর রহমান

পটভূমি

মাদকাসক্তি বাংলাদেশে এখন আর অপরিচিত কিংবা নতুন কোন শব্দ নয়। স্বাধীনতার পূর্বে মাদকাসক্তি নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তা ব্যাপকভাবে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পরপর দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিভিন্ন কারণে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। এ সময় দেশের যুব সমাজের মধ্যে প্রচন্ডরকম অস্থিরতা দেখা দেয়। পাশাপাশি এসমস্ত আন্দোলন ও তথাকথিত পপ সংগীত এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে যুব সমাজের মধ্যে। এর ফলশ্রুতিতে যুব সমাজের মধ্যে নেশা করার প্রবনতা ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশে মাদক

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের অবস্থান গোল্ডেন ট্রায়াংগেল (লাওস, মায়ানমার ও থাইল্যান্ড-এর সীমান্ত এলাকা নিয়ে গঠিত) এবং গোল্ডেন ক্রিসেন্ট (পাকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকা নিয়ে গঠিত)-এর নিকটবর্তী হওয়ায় মাদক ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে করিডোর হিসাবে ব্যবহার করে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সুচতুর মাদক ব্যবসায়ীরা যুবসমাজের মধ্যে বিরাজমান অস্থিরতা ও হতাশার সুযোগ নিয়ে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে মাদক ব্যবহারে প্ররোচিত করে। যুব সমাজও মাদক-এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন না থাকায় মাদকের নীল মায়াজালে আটকা পড়ে যায়। ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে মাদকাসক্তের সংখ্যা। মাদক সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় অভিভাবকগণও তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়। আশির দশকে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করে হেরোইন-এর মরন ছোবলে আকন্ঠ নিমজ্জিত দেশের ভবিষ্যত সূর্য সন্তানদের। সে সময় থেকেই মূলত মাদকের এই ভয়াবহ করাল থাবা থেকে যুব সমাজকে রক্ষাকল্পে সুশীল সমাজ সচেতনতা সৃষ্টিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। নব্বই এর দশকে এসে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠলেও তা শুধুমাত্র শহর কেন্দ্রিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এর ফলে মাদকের আগ্রাসন মফস্বল শহর ও গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতা

বাংলাদেশে এখন মোট মাদকাসক্তের সংখ্যা কত তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বিভিন্ন সূত্র থেকে বলা যায় যে, পঁচিশ লক্ষাধিক নিয়মিত মাদকাসক্ত রয়েছে। পাশাপাশি অনিয়মিত মাদকাসক্তের সংখ্যা অগণিত এবং এরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ যে কোন সময়েই এরা পুরোপুরিভাবে আসক্ত হয়ে যেতে পারে। কর্ম অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, বর্তমানে নেশার উপকরণ হিসাবে ফেনসিডিল (কফ সিরাফ) বা ডাইল যুব সমাজের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। পরবর্তীতে রয়েছে হেরোইন, গাঁজা, চরস প্যাথেডিন, টি ডি জেসিক, ঘুমের বড়ি

প্রভৃতি। প্রথম দিকে নেশা শহর কেন্দ্রীক হলেও বর্তমানে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে গ্রামাঞ্চলেও এখন আসক্তি আশংকাজনক হারে বাড়ছে। পরিণতিতে দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। বাড়ছে বিবাহ বিচ্ছেদ। ভাঙছে সংসার ও সামাজি বন্ধন। নেশা ও আসক্তির কারণে দেশের অধিকাংশ পরিবার আজ অনিশ্চয়তার মুখোমুখি।

নেশার কারণ

নেশার কারণ হিসাবে কৌতুহল, বন্ধুদের চাপ, হতাশা, মাদকের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞতা, নৈতিক শিক্ষার অভাব, মাদকের সহজলভ্যতা ও সহজ প্রাপ্যতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ

এ অনিশ্চয়তার মেঘ দূর করতে হলে এখনই সম্মিলিতভাবে সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। গ্রহণ করতে হবে বিভিন্ন সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম। যাতে করে মাদকের চাহিদা হ্রাস করা সম্ভব হয়।

মাদক চাহিদা হ্রাস

মাদকাসক্তি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে নতুন করে কেউ যেন আর মাদকাসক্ত না হয়। পাশাপাশি আসক্ত ব্যক্তিদের সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে মাদক বিমুক্ত করে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করে মাদক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা।

সনাতনী চিকিৎসা

বাংলাদেশে আনুমানিক ২৫ লক্ষাধিক মাদকাসক্ত রয়েছে। অথচ এ বিপুল পরিমান আসক্তের চিকিৎসার জন্য ঢাকায় ১টি ৪০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারী হাসপাতাল ও কয়েকটি বেসরকারী ক্লিনিক রয়েছে। বেসরকারী পর্যায়ে চিকিৎসা কিছুটা ব্যয়বহুল। ঢাকার বাইরে বর্তমানে কোন কোন বিভাগীয় শহর বা জেলা শহরে বেসরকারী পর্যায়ে ক্লিনিক গড়ে উঠলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত। ফলে অধিকাংশ মাদকাসক্তের পক্ষে চিকিৎসা গ্রহণ সম্ভবপর হয় না। এছাড়া সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থায় কমিউনিটির অংশগ্রহণের সুযোগও সীমিত। এখানে ফলোআপ সার্ভিস ঠিকমত কাজ না করায় আসক্তরা চিকিৎসা শেষে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় আসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থায় একদিকে যেমন সকল মাদকাসক্তের চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না; অপরদিকে যারা চিকিৎসা নিচ্ছে তারাও প্রয়েজনীয় ফলোআপ সার্ভিসের অভাবে পুনঃমাদকাসক্তিতে জড়িয়ে পড়ছে। এ বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করেই ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন 'আমিক' শাখাসমূহের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিরাজমান ভয় ভীতি দূর করা। মাদক চিকিৎসাকে স্থানীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং মাদক প্রত্যাহার নিয়ে যে অতি নাটকীয়তা রয়েছে তা দূর করা।

স্থানীয় পর্যায়ে চিকিৎসা ও পূনর্বাসন কার্যক্রম

প্রায়শই মাদকাসক্তি সমস্যাকে মনোদৈহিক সমস্যা হিসাবে না দেখে শুধুমাত্র ক্লিনিক্যাল সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে সে মোতাবেক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে আসক্ত ব্যক্তির

শারীরিক চিকিৎসা হলেও মানসিক নির্ভরশীলতার চিকিৎসা হয় না। এ প্রেক্ষিতে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, সমাজে আসক্ত ব্যক্তি এবং তার পরিবারকে অন্য চোখে দেখা হয় বলে অর্থাৎ সোস্যাল স্টিগমার কারণে আসক্তের চিকিৎসা অনেকাংশেই গোপনে হয়ে থাকে। ফলে মাদক সমস্যা প্রতিরোধে কমিউনিটি সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

এ সকল বিষয় বিবেচনা করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৯৭ সালে মাদকাসক্তের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থায় এক ভিন্নতর নতুন অথচ কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করে। মিশন তার আমিক শাখা কমিটির মাধ্যমে এপর্যন্ত ঢাকা, চিটাগাং, রাজশাহী ও যশোর এলাকায় ক্যাম্প এ্যাপ্রোচে সমগ কমিউনিটির অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই চিকিৎসা সেবায় আসক্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারকে কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে। ফলে চিকিৎসাপূর্ব, চিকিৎসা চলাকালীন এবং চিকিৎসা পরবর্তীতে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবসহ উক্ত কমিউনিটির সকলেই এই টোটাল এ্যাপ্রোচে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

ক্যাম্প আয়োজনের পূর্বে করণীয়

ডিটক্স ক্যাম্প বা মাদক বিমুক্তকরণ ক্যাম্প করার জন্য এলাকায় মাইকিং, পোষ্টার, গণযোগাযোগ, আলোচনাসভা, পথসভা, র‍্যালী প্রভৃতি ক্যাম্পেইন মূলক কার্যক্রম প্রথম থেকে জোরে-শোরে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। পাশাপাশি ক্যাম্প আয়োজনের জন্য স্থানীয় প্রশাসন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য কর্মী, হাসপাতাল ইত্যাদি সকলকে লিখিতভাবে জানাতে হবে এবং তাদের সহযোগিতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। এর সাথে কর্ম এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় নেতা, এনজিও কর্মী, সমাজকর্মী, সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

চিকিৎসার জন্য আসক্তদের নির্বাচন ও উদ্বুদ্ধকরণ

চিকিৎসার জন্য আসক্তদের চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে এলাকার সমাজকর্মী, স্বাস্থ্য কর্মী ও রিকভারী এ্যাডিক্টদের সহায়তা নেয়া হয়। মাদকাসক্ত চিহ্নিত করার সময় আসক্তের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আসক্তির সময়, মাদক গ্রহণের পরিমান, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি বিবেচনা করা হয়। যে সকল আসক্তকে ক্যাম্পে চিকিৎসা প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয় তাদেরকে তাদের পরিবারসহ চিকিৎসার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়। যাতে পরিবারের সদস্যরা সর্বাত্মক সহযোগিতা দেন।

কাউন্সেলিং

মাদকাসক্তি চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য মাদকাসক্তদেরকে ক্যাম্পে ভর্তির পূর্বে নুন্যতম ৪ বার কাউন্সিলিং দেয়া হয়। ১ম বার কাউন্সিলিং এ আসক্তির কারণে মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে, ২য় বার আসক্তি এবং প্রত্যাহার জনিত উপসর্গ (Withdrawl Syndrom)-এর দিক নিয়ে; ৩য় বার ক্যাম্পে চিকিৎসাকালীন সময়ে যেসব সম্ভাব্য সমস্যা দেখা দিতে পারে ও তা কিভাবে সমাধান করা হবে সে বিষয়ে ধারণা দিয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। ৪র্থ বার কাউন্সেলিং এর সময়ে তার মানসিক জোর বাড়ানোর

জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। অবশ্য ১ম বার কাউন্সেলিং এর সময়ই আসক্তকে মাদকদ্রব্য গ্রহণের পরিমান নিজ থেকে কমানোর চেষ্টা করতে বলা হয়।

ক্যাম্প নির্বাচন

ক্যাম্প যে কোন স্থানেই হতে পারে। যেমন- কমিউনিটি সেন্টার, স্কুল বা কলেজ, ক্লাব ঘর প্রভৃতি। তবে স্থানটি যেন যথেষ্ট নিরাপদ হয়। যাতে কোন রোগী পালিয়ে যেতে না পারে। পাশাপাশি বাইরে থেকে কোন মাদকদ্রব্য যাতে ক্যাম্পে ঢুকতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও গোছলের জন্য পর্যাপ্ত পানির ও বাথরুম সুবিধা থাকতে হবে।

ক্যাম্প পরিচালনা কমিটি

কমিউনিটি কমিটির সদস্য ও এলাকার সেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে ক্যাম্প পরিচালনা কমিটি গঠন করে তাদের মধ্যে থেকে একজনকে ক্যাম্পের পরিচালক নির্বাচিত করা হয়। এই কমিটি ক্যাম্পের জন্য একটি নীতিমালা তৈরী করে তা ক্যাম্পে টানিয়ে রাখে এবং সকল কর্মকান্ড এই নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে।

মাদক বিমুক্তকরণ ক্যাম্প

এই ক্যাম্প সাধারণত ১০ থেকে ১৫ দিনের জন্য আয়োজন করা হয়। ক্যাম্প উদ্বোধনের দিন স্থানীয় প্রশাসন, কমিউনিটি কমিটি ও পরিবারকে আমন্ত্রণ করে তাদের সামনে আসক্তদের দিয়ে শপথ করানো হয়। ক্যাম্প চলাকালীন সময়ে আসক্তদের কাউন্সেলিং এর সাথে মেডিটেশন শেখানো হয়। ক্যাম্পে পর্যাপ্ত খেলাধূলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকায় এবং ক্যাম্পের যাবতীয় কাজ রোগীরা নিজেরা শেয়ার করে থাকে। ক্যাম্পের চিকিৎসার শেষ দিনে স্থানীয় প্রশাসন ও এনজিও যাদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচি রয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ করে রোগীদেরকে এসকল সেবা ও সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে মাদক সমস্যা অভিশাপ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার। মাদকের কুফল সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি যারা ইতোমধ্যেই আসক্ত হয়েছে তাদের জন্য পূর্নাঙ্গ চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সে প্রেক্ষিতে স্থানীয় পর্যায়ে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে অনেক ইতিবাচক। 'আমিক' থেকে এ পর্যন্ত ১৬৭ এর অধিক আসক্তকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দিয়ে তাদের ফলোআপ পর্যায়ে রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগের মনোভাব অত্যন্ত ইতিবাচক। তবে মাদকের সহজ প্রাপ্যতা ও অবারিত প্রবেশের জন্য এরা সব সময়ই ঝুকিপূর্ণ। তাই প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধের। আসুন সকলে মিলে এই সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করে মাদক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

লেখক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার এবং ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব, 'আমিক' কেন্দ্রীয় কমিটি।

আল-কুরআন ও আলহাদীসে মাদক প্রসঙ্গ

যে বস্তু সেবনে মাদকতা সৃষ্টি হয় এবং যা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে 'মাদকদ্রব্য' বা খাম্‌র বলে। অন্য কথায়,

যে সকল বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে এবং সেবনে বোধশক্তি হ্রাস পায় তাদের সকল শ্রেণীই 'মাদকদ্রব্য' (খাম্‌র) এর অন্তর্ভূক্ত।

মাদকদ্রব্যের আরবী প্রতিশব্দ খাম্‌র বস্তুতঃ 'খা, মিম ও রা' এই তিন অক্ষরের ক্রিয়ামূল হতে গঠিত। শব্দটির অর্থ- 'আচ্ছন্ন করা', 'সমাচ্ছন্ন করা' ঢেকে দেয়া। কোনও বস্তুর সাথে মিশে গিয়ে ক্ষতির সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই 'মদ' 'শরাব' ও 'মাদকদ্রব্যকে' 'খাম্‌র' বলা হয়। কারণ, উহা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেয় এবং বুদ্ধির উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। 'খাম্‌র' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, 'খাম্‌র'- এর আওতায় জ্ঞান বিলুপ্তকারী যে কোন মাদকদ্রব্য অন্তর্ভুক্ত। "জ্ঞান আচ্ছাদিত করে দেয় এমন প্রতিটি মাদকের নাম 'খামর'।" 'খামর'- যে কোন জিনিসের রস, যা মাদকতা সৃষ্টি করে। জ্ঞানের কেন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে দেয় বিধায় এর নাম 'খাম্‌র'।

শরী'আতেও এ আভিধানিক মর্মই গৃহিত হয়েছে। 'খাম্‌র' বা মাদক যা জ্ঞান বুদ্ধি আচ্ছাদিত করে দেয় (বুখারী - ইব্‌ন 'উমর রাঃ সূত্রে)। "খাম্‌র বা মাদক যা জ্ঞানের উপরে প্রলেপ সৃষ্টি করে তা আবৃত করে দেয় এবং তার উপর আচ্ছাদন ছড়িয়ে দেয়"।

একদা হযরত উমর (রা) খুতবায় বলেছিলেন, হে লোক সকল! 'শরাব' হারাম হওয়ার বিধান নাজিল হয়েছে। শরাব পাঁচটি বস্তু হতে প্রস্তুত করা হয়। আঙ্গুর, মধু, খেজুর, গম ও যব। 'খাম্‌র' হল এরূপ বস্তু যা মানুষের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেয় এবং যা সেবনে বুদ্ধির লয় ঘটে।

প্রথম আয়াত

ইমাম রাজী (রহ) লিখেছেন মদ ও মাদক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের চারটি পর্যায়ে আয়াত নাযিল হয়েছে। সর্ব প্রথম মক্কা-মোয়াজ্জমায় সূরা- নাহ্‌লের ৬৭ নং আয়াত নাজিল হয়। আয়াতটির অর্থ নিম্নরূপ-

> "এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক। এতে অবশ্যই বোধ সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।"

এটি হচ্ছে মদ/মাদক সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের প্রথম বক্তব্য। যাতে মদ/মাদক যে ভাল নয় তাই বিবৃত হয়েছে। খেজুর ও আঙ্গুরের মত ফল সমূহ থেকে মানুষ নিজেদের খাদ্যোপকরণ ও লাভজনক দ্রব্য সামগ্রীর প্রস্তুতিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও কিছু অবদান আছে। আর এই নৈপুণ্যের ফলেই দু'ধরনের দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হল - মাদকদ্রব্য যাকে নানা নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয়টি হল - উত্তম জীবনোপকরণ/উত্তম রিযিক। যেমন - খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করায় অথবা শুকিয়ে খুরমা, কিশমিশ আকারে মওজুত করে নেয়া যায়। কিংবা নিঃসৃত রস দিয়ে 'শরবত' 'নাবীয', 'সিরকা' ইত্যাদি তৈরি করা যায়। সুতরাং, আয়াতের মমার্থ এই যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অপার শক্তিবলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তা দিয়ে খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার জ্ঞানও দিয়েছেন। এখন এটা তাদের নিজেদের অভিরুচি তারা কি প্রস্তুত করবে - মাদকদ্রব্য তৈরি করে বিবেক বুদ্ধিকে নষ্ট করে মতাল হবে - না সুখাদ্য তৈরি করে শক্তি অর্জন করবে ?

দ্বিতীয় আয়াত

ইসলামের প্রথম যুগে জাহেলিয়াত আমলের সাধারণ রীতি-নীতির মত মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রাসূলে করীম (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন, তখনও মদীনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারুকে আযম উমর (রা), হযরত মাআয-ইবনে জাবাল (রা) এবং কিছু সংখ্যক আনসার সাহাবী রাসূলে করিম (সা) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদও ধ্বংস করে দেয়; এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? এ প্রশ্নের উত্তরেই একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ হচ্ছে মাদানী আয়াত সমূহের প্রথম আয়াত যা মুসলমানদেরকে মদ জুয়া হতে দূরে রাখার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ আয়াতের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ-

"লোকেরা তোমার নিকট মাদক ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, উক্ত দু'টি বস্তুতে মহাপাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য উপকারও রয়েছে। কিন্তু উহাদের অপকারিতা উহাদের উপকারিতা অপেক্ষা অধিকতর।" (সূরা- বাকারাঃ ২১৯)

উক্ত আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয় নাই, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে যে, মাদক বা মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। বলতে গেলে আয়াতটিতে মাদক সেবন বা মদ্যপান ত্যাগ করার জন্যে এক প্রকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সুতরাং, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ

মনে করেছেন, এ আয়াতে মদকে তো হারাম করা হয়নি বরং এটা ধর্মের বিপক্ষে ক্ষতিকর কাজে ধাবিত করে বলে একে পাপের কারণ বলে স্থির করা হয়েছে।

তৃতীয় আয়াত

এ প্রসঙ্গে তৃতীয় যে আয়াত নাযিল হয় বাংলায় তার অর্থ নিম্নরূপ-

"হে মু'মিনগন! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হইও না যতক্ষন না তোমরা যা বল, তা বুঝতে পার "(সূরা – নিসা : ৪৩)"

মদ ও মাদক হারাম হওয়ার পূর্বে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। ইমাম রাজী (রহ) এ আয়াতের শানেনুজূল সম্পর্কে ২টি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

১) বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রা) কয়েকজন বিখ্যাত সাহাবীকে তাঁর বাড়িতে দাওয়াত করেন। যেহেতু তখন পর্যন্ত মদ্যপান হারাম/নিষেধ করা হয়নি। তাই খাবার-দাবারের পর প্রথা অনুযায়ী মদ সরবরাহ করা হয়। কিছুক্ষণ পর মাগরিবের নামাজের আজান হয়। তাঁদেরই একজনের ইমামতিতে নামাজ শুরু হল; নেশাগ্রস্ত থাকায় সূরায়ে ক্বাফিরুন ভুল পড়লেন। ফলে অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

২) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবী সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। মদ/মাদক নিষিদ্ধ হবার পূর্বে তখন তাঁরা মদ পান করতেন এবং প্রিয় নবী (সা) এর সাথে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ আদায় করতেন এ আয়াত দ্বারা তা নিষিদ্ধ করা হয়। (তাফসীরে কবীর ও তাফসীরে নূরুল কুরআন)

উক্ত আয়াত নাযিল হবার পর অনেক সাহাবা বুঝতে পারলেন যে, শরাব পান করা একটি মহাপাপের কাজ। তাই তাঁরা উহা ত্যাগ করলেন। এই রূপে পর্যায়ক্রমে যখন সাহাবীগণের অন্তরে শরাব পানের অপকারিতা ও উহার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ধারণা উত্তমরূপে বদ্ধমূল হয়ে গেল এবং যখন উহা ত্যাগ করার জন্য তাঁদের মধ্যে পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেল, তখন উহাকে সুস্পষ্টরূপে হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে মায়েদার আয়াত নাজিল করেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াত

মাদক সম্পর্কে চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ-

"হে মু'মিনগন! মদ জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্নায়ক শর ঘৃন্যবস্তু ও শয়তানের কাজ। অত এব তোমরা উহা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরন ও সালাত হতে বিরত রাখতে চায়। অত এব তোমরা কি উহা হতে নিবৃত্ত হবে না?" (সূরা মায়েদা– ৯০–৯১)।

উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কিতাবে কিছু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

১) একদিন সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) উন্নতমানের খাদ্য তৈরি করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কয়েকজন সাহাবাকে দাওয়াত করেন। তাঁদের মধ্যে একজন আনসারীও ছিলেন। সা'দ (রা) তাঁদের জন্য একটি উটের মাথা রান্না করেন। এরপর তাঁদেরকে তা খাওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। যখন তাঁরা তা ভক্ষণ করে মদ পান করে মাতাল হয়ে যান ও বাজে কথা বলা আরম্ভ করেন। সা'দ জবাবে কিছু বলেন, তখন আনসারী রেগে যান এবং উটের মাড়ীর হাড় উত্তোলন করে আঘাত করে সা'দ (রা) -এর নাসিকা ভেঙ্গে দেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মদকে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং এ আয়াত নাযিল করেন। (তাফসীরে তাবারি শরীফ)

২) হযরত ওতবান ইবনে মালেক কয়েকজন সাহাবীকে দাওয়াত করেন, যাঁদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবী ওক্কাস ও উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর মদ্য পান করার প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্ব-পুরুষদের অহংকারমূলক বর্ণনা আরম্ভ হয়। সা'দ ইবনে আবী ওক্কাস একটি কবিতা আবৃতি করলেন যাতে আনসারদের দোষারূপ করে নিজেদের প্রশংসাকীর্তন করা হয়। ফলে একজন আনসার যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গণ্ডদেশের একটি হাড় সা'দ এর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে সা'দ রসূল (সা) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন হযূর (সা) দোয়া করলেনঃ "হে আল্লাহ! শরাব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিষ্কার বর্ণনা ও বিধান দান কর।" তখনই সূরা মায়েদায় উদ্ধৃত মদ ও মদ্যপানের বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আয়াত দু'টি অবতীর্ণ হয়। এতে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে। (তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন)

মদ্যপান অপবিত্র ও শয়তানের কাজ, যা মানুষকে আল্লাহর রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না।

মহানবী (সা) বলেন ঃ "মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ ব্যক্তির ওপর মহানবী (সা) লা'নত করেছেন। ১. যে নির্যাস বের করে ২. প্রস্তুতকারী ৩. পানকারী (ব্যবহারকারী) ৪. যে পান করায় ৫. আমদানীকারক ৬. যার জন্য আমদানী করা হয় ৭. বিক্রেতা ৮. ক্রেতা ৯. সরবরাহকারী ১০. লভ্যাংশ ভোগকারী (তিরমিযি)। এছাড়াও রাসুলুল্লা (সা) এরশাদ করেছেন যে, যে বস্তু অধিক পরিমাণ জ্ঞান লোপকারী, তার কম পরিমাণও হারাম (আবু দাউদ)। তিনি আরো বলেন যে, শরাব এবং ঈমান একত্রিত হতে পারে না। (নাসায়ী)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আধিদপ্তর ও জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি কর্তৃক প্রকাশিত ইমাম প্রশিক্ষণের জন্য মাদক প্রতিরোধ শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সামগ্রী অবলম্বনে।

বুমেরাং

অধ্যাপিকা রওশন আরা ফিরোজ

হাসেমের হাতে টাকার বাণ্ডিল দেখে চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠলো আলি হোসেনের, 'কিরে? আইজ বুঝি অনেক বেচা হইলো ?'

'জি চাচা, ডাইলই বেশি টানছে, আর ইনু মিয়াও অনেক বেচা হইছে।'

'সুইচ চায় নাই কেউ?'

'চাইছিলো মাত্র একজন'

'ইনু আর ফ্যান্সিরে পছন্দ না অইলে সুইচ নিতে কইবি, বুজলি?'

'হ কমুনে।'

টাকার বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে খুব আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে আলি হোসেন। ডালভাতের বাঙালি যে এই ডাইলের পাগল হবে কে জানতো? ডাইল মানে ফেন্সিডিলের খুব কদর বেড়েছে বাজারে। গাবতলি আর সায়েদাবাদ থেকে আনতে আনতেই ফুরিয়ে যায়। ওষুধের দোকানে আলমারীর পেছনে থাকে সব ডাইলের বোতল। চোখ মুখ ফুলা বা গালচাপা ভাঙা খদ্দেরের চেহারা দেখলেই বুঝা যায় কি চায়? ছোট ওষুধের দোকান আলি হোসেনের। আগামসি লেনের এক গলিতে। দোকান না বলে একটা টং বললেও চলে। টং এর পেছনে ডাইলের আসল গুদাম। মক্কেলের অর্ডার মতো খুচরা কিছু এনে টং-এর ভেতর রাখা হয়। বাইরে থেকে গুদাম কারো বোঝার উপায় নেই। গুদামের পাশে আখ ভাঙানো হয়। ড্রামের উপর থেকে আখের পাঁজা। ভিতরে সব ডাইলের বোতল। যেসব মক্কেল এখানে দাঁড়িয়েই খেতে চায় তাদের জন্য গ্লাসের ব্যবস্থা আছে। মাঝে মাঝে আখ ভাঙানো হয়। লোকজন দূর থেকে ভাবে আখের রসই বিক্রি হচ্ছে।

শুধু শালার ঐ পুলিশগুলো আর নেশাখোর ছোকরাগুলো খবর রাখে রসের আড়ালে বিক্রি হচ্ছে ফেন্সিডিল। ৫০ টাকার ডাইল ১০০ টাকায় বিক্রি। একশোভাগ লাভ। আর পুলিশগুলোকে হাজার পাঁচেক টাকা না ধরিয়ে দিলে আর রক্ষা নেই। এসে ড্রাম নিয়ে টানাটানি শুরু করবে। বোতল ভাঙবে, থানায় নিয়ে যাবে। কিন্তু টাকা ধরিয়ে দিলে সব ঠাণ্ডা। দুনিয়াটাই টাকার বশ। আলি হোসেন বসে বসে টাকার হিসেব কষে আর খুশিতে সিগারেটে সুখটান দেয়। মনে মনে হাসে। ইনু মানে ইনোকটনের বাজারটাও ভালো যাচ্ছে। কম পাওয়ারের ঘুমের বড়িতে যাদের কাজ হয় না তারা খায় ইনোকটেন। আহা! এতো বড় লাভের ব্যবসাটা।

ছোকরাগুলো নাকি ছ্যাঁক খাওয়া পার্টি। চাকরি পায় না, বেকার। কেউ আবার লাইলিকে না পেয়ে মজনু হয়ে গেছে। ডাইল খেয়ে 'সুইচ' নিয়ে সব ভুলে যায়। সুইচ মানে

প্যাথিড্রিন ফুটানো। মনের কথা, দেহের ব্যথা সব ভুলে যায়। হে খোদা, বেকার সমস্যা, ছ্যাঁক খাওয়া বাড়তে থাকুক। খদ্দেরগুলো ঢুলু ঢুলু চেখে ঘোরাঘুরি করুক এখানে। আলি হোসেনেরও ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠুক করে আনে, নাকি হাইজ্যাক করে? দূর এসব ভেবে আলি হোসেনের কি দরকার? নেশাখোরগুলো না থাকলে যাত্রাবাড়িতে তার বাড়ি করার পয়াস আসতো কোথা থেকে? কয়দিন আগে নতুন সুপার মার্কেটে দোকান রেখেছে সে তো এই টাকা থেকেই।

খুশি খুশি মনে বাসায় ফিরে আলি হোসেন। রড-সিমেন্টের 'ক্লিয়ার' করতে হবে আজ। বাড়ির কনস্ট্রাকশন প্রায় শেষ হবার পথে। তার স্ত্রী কাছে আসে। কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করে বলে, 'হাফিজ পাঁচশো ট্যাকা চায়।'

'ক্যান?'

'টাংগাইল যাইবো, বন্দুর বইনের বিয়া।'

'ট্যাকা গাছে দরে নাকি? অরে রোজগার করতে কইও।'

'আইজ দেও, আর চাইবো না।'

'বহুত কষ্টের রোজগারের ট্যাকা, খেলা পাইছে নাকি?'

'তোমার তো ডাইল বেচা ট্যাকা।' কতাটা বক্রসুরে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে হাফিজের মা।

'কি কইলি?' রেগে যায় আলি হোসেন।

'আর একবার কইলে চুলে দরুম কিন্তু।'

'ওইডাই তো পারো।'

'খবরদার! কথা কবি না। যাত্রাবাড়িতে বিল্ডিং করতাছি কি আমার লাইগ্যা। নাকি তোর ঐ নওয়াবজাদা পোলার লাইগা?'

'আমার টিনের গরই ভালো।'

'কত বড়ো রিস্কের বেবসা জানোছ?'

'ট্যাকার লোভে তুমি রিসকে যাও, আমার কি?'

'চোপা রাখ। আইজ রাইতে দোকানে লোক কম। হাফিজরে কও টাংগাইল না যাইয়া ডিউটি দিতে।'

'না, আমি ঐ নেশার জিনিস অরে বেচতে দিমু না। গুনাহর কাজ।'

'ইস্, কতো আমার ঈমানদার মাইয়ালোক। শালা, যার লাইগ্যা চুরি করি সে কয় চোর। হাফিজরে দোকানে না পাঠাইলে ভালো অইবো না কিন্তু। অরে কইও এ আমার হুকুম।'

'আব্বা, ট্যাকা দিবা না। হাফিজ এসে দাঁড়ায়।'

'না।'

'আমার সব বন্ধুরা খাইবো।'

'আগে আজ দোকানে ডিউটি দিবি তারপর দেখা যাইবো।'

'আমি ঔষধের নামদাম জানি না বাবা।'

'তর জানতে অইবো না। হাসেমই সব করব। তুই খালি হিসাব রাখবি।'

'আমার পড়া আছে বাবা।'

পড়ার কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে আলি হোসেন। কইছিলাম বাপের বেবসা দেখ, উনি পড়ালেখা করবেন। তোর ঐ প্রপেছারের চাইতে বেশি রোজগার করি আমি জানোছ? ঔষুধ বেচা টেকা নিয়া সাবধানে বাসায় ফিরবি। খবরদার বাকিতে মাল দিবি না কাওরে।'

আলি হোসেন যাত্রাবাড়ির জন্য বেবিট্যাক্সি ধরে। রাজমিস্ত্রিগুলি অতি চালাক। সিমেন্টে কত বালি মিশাচ্ছে কে জানে? কোন শালারে বিশ্বাস করা যায় না। ওষুধের দোকানের আগের ছোকরাটা ছিল মিনমিনে শয়তান। মানুষের জন্য কত তার দরদ। একগাদা কথা বলে মেজাজ খারাপ করে দিয়েছিল আলি হোসেনের।

'চাচা, ঐ মহিলা আইজও আইছিলো। অনেক কান্দাকাটি করছে। কইছে মাঝে মাঝে আমারে টেকা দিব। তবু যেন ছাওয়ালরে ডাইল, বড়ি এগুলি না দেই।'

'কত ট্যাকা দিবার চায়?'

'একমাসে পেরায় দুইশত ট্যাকা।'

থুঃ, মুখ দিয়ে থু-থু ছিটায় আলি হোসেন। 'মাওর এই কয়ডা ট্যাকা, কইলি না ক্যান, আপনার পোলা নিতে চাইলে আমরা করুম কি? জিনিস আছে বেচুম, কে মরলো বাঁচলো হেইডাতো আমাগো দেখার কথা না?

'এই কতাও কইছিলাম। মহিলা রাগ হয়। বলে, 'ডাক্তারের পেরেসকিরিপসন ছাড়াতো ওষুধ বেচার নিয়ম নাই।'

কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠে আলি হোসেন, 'হুঁ, কত নিয়মই তো আছে দ্যাশে, মানে ক্যাডা।' 'চাচা, ঐ মহিলার কান্দা চেহারা দেখলে আমার মায়ের কথা মনে অয়।'

'অতো দরদ থাকলে ভাগ শালা। বেবসা করতে আইসা এ্যাতো দরদ দেখাইলে চলবো না।'

যাবার আগে ছোকরা ঐ মহিলাকে বলে যার 'খালাম্মা, আপনার পোলারে বাইন্দা রাখেন। আমর মনিব বড় জালিম। কাস্টমার ফিরাইবো না।'

এ কথা শুনে আবারও হাসে আলি হোসেন, বাইন্দা রাখাও অসম্ভব। গ্যারা উঠলে ঐ ছেলেরে লোহার শিকল দিয়াও বাইন্দা রাখা যাইবো না। সব ভাইংগা চুইর‍্যা চইলা

আসব। এরে কয় নেশার টান।'

'হাসেমের গুন্দা সিমারের চাইতেও শক্ত। একেবারেই মায়া দয়া নাই। এই ব্যবসায় মায়া থাকতে নাই। খালি ট্যাকা আর ট্যাকা।'

আলি হোসেনের কড়া অর্ডার, বাকী দেওয়া যাবে না কাউকে।

যাত্রাবাড়ি থেকে অনেক রাতে বাড়ি ফিরে আলি হোসেন। ওষুধ বেচার খবর জানায়, হাফিজকে ডাকে। তার মা এসে বললো, হাফিজ তো ফিরে নাই।'

'খোঁজ কর নাই?'

'আমি কারে দিয়া খোঁজ নিমু?'

খুশিতে গুনগুনিয়ে উঠে আলি হোসেন। নিশ্চয়ই আজ খদ্দেরের খুব ভিড়। বেশি রাতে নেশাখোরদের নেশা বেড়ে যায়। ছোট ছেলে আক্কাছকে ঘুম থেকে তুলে পাঠালো দোকানে। একটু পরে আক্কাছ এসে খবর দেয়। কে বা কারা দোকানে ভাংচুর করে গেছে। হাসিম ও হাফিজের কোন পাত্তা নেই। দৌড়ে যায় আলি হোসেন। নিশ্চয়ই পুলিশ শালার কাজ। গত সপ্তাহে চান্দার রেট ডবল চেয়েছিল। ও পাত্তা দেয় নি। দিন দিন এদের খাই বেড়ে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে রাস্তায় ধাক্কা খায় এক ডাবওয়ালার সাথে। ফুটপাতেই দোকান, ওখানেই ঘুমায়। ওর কাছ থেকে জানা গেল ঘন্টা খানেক আগে এক দল নেশাখোর এসে বাকিতে মাল চায়। হাসেম আর হাফিজ বাকিতে দিতে না চাওয়ায় দোকান ভাংচুর তো করেছেই সব ডাইলের বোতলসহ হাফিজকেও ধরে নিয়ে গেছে। ভয়ে হাসেম পালিয়েছে।

পাগলের মতো আগামসি লেনের গলিতে ঢুকে পড়ে। নেশাখোরগুলো আড্ডা দেয় ঐ গলির মোড়ে। কিন্তু আজ এতো নিস্তব্ধ কেন? আর একটা গলিতে এগুতে থাকে আলি হোসেন। কয়েকটা নেড়ি কুকুর ডাকছে। সাহসী আলি হোসেনের গা ছম ছম করে উঠে। পুলিশে খবর দিবে নাকি? হাফিজকে ওরা কোথায় নিল? আরো ডানদিকের গলিতে পা ঘোরায় আবার। হঠাৎ করে পায়ে হোঁচট খেল, ড্রেনের কাছে কি ওটা? কারেন্ট নেই, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। পকেট থেকে টর্চ বের করে। দেহ হিম হয়ে যায়। হাফিজের রক্তভেজা লাশটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথা ঘুরে পড়ে যাবার আগে শত সহস্র নেশাখোরের হো হো হাসি যেন গর্জে উঠল আলি হোসেনের কানে।

আপনার শিশুকে সিগারেটের বিষাক্ত ধোঁয়াথেকে দুরে রাখুন

লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা এবং আমিক কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ।

"Eradication of Tobacco"

Capt. (Retd.) M.M. Feroz

"Amik" in Bangladesh - an excellent programme,
Which is our pride in Ahsania Mission's organograme.

"Amik" works for eradicating tobacco which is injurious,
It is understood by all who are judicious.

The work has begun; we have long way to go,
Many more organisations will come in its row.

Addiction is a dreadful misery for all,
For eradicating it we give a clarion call.

It is the youths and the juvenails whom we should guard,
Instead of tobacco we should offer them curd.

This nation can on longer tolerate addiction,
Which increases at the time of election.

At that time tobacco is distributed to all,
The young, the old, the short and the tall.

This kind of leadership we have in our country,
Where tobacco for votes are given free!

Oh God ! save us from this turmoil,
And give us a beautiful nation in this soil.

Writer is the Director (Admin.), Department of Youth Development & Member AMIK Central Committee.

মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে তার কাছে বলছি

হাবীবা খানম

যারা মাদকতায় ঋজু ও অবলিপ্ত বিভ্রান্ত বিলাসী আসক্ত
কিংবা হতাশাগ্রস্ত
তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ চাই জীবন গঠনে,
সংস্কৃতির মধ্যে বাঁচার আনন্দ ও ভ্রাতৃত্ববোধে
জেগে উঠবে দেশ।
চাই কাজ চাই নির্মল পরিবেশ
উদার অমল আকাশে প্রাণ ভরে
   নিঃশ্বাস নিতে চাই
অনন্ত যুদ্ধ ঘোষিত হোক সেইসব ভ্রান্ত-
   কুচক্র মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে
যারা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে যৌবন সেনাদলের-
সবল প্রাণ করে দেয় নিঃস্প্রাণ ও ক্ষয়িষ্ণু
আহা! কি নিদারুণ জীবনের পরাজয়
নেশাগ্রস্তদের নির্মম অপমৃত্যু দন্ত পলে পলে-
কেন কালো কুৎসিৎ এই চিল
   সরল উন্নত মস্তিস্কের সম্মুখে তোলে শংকা
কেন অভাবিত সুপ্ত শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়না এখন যুবক!
আমি মাদকাশক্তির বিরুদ্ধে তার কাছে বলেছি
এটা তোমাকে ধ্বংস করে দেবে ঠিক যেমন
কাঠ পোড়ালে অবশিষ্ট হয়ে থাকে ছাই
তুমি ছাই কেন হবে
তুমি ফুল ফোটা ফুলের আঘ্রান
চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ দেখোনি
যখন তুমি জানালার গ্রীল স্পর্শ করো
কিংবা কোন রাজপথ ফুটপথ
ধরে হাঁটো তখন দেখোনি
কি ভীষন ব্যস্ততার মাঝে গড়ে উঠছে-
   নগর বন্দর গ্রাম জনপদ
আমাদের সহস্র বছরের সাহিত্য রয়েছে
আছে উচ্চাঙ্গ সংগীত নূরনামা কুরআন হাদিস
আছে পুরান ত্রীপিটক গীতা
আমাদের আছেন রবীন্দ্রনাথ নজরুল
সক্রীটিস আছেন লালন
তাঁদের শোনোনি ?
কেন হতাশাচ্ছন্ন বক্ষে দগ্ধ হবে-
এই বসন্ত ও কৈশরের মেখলা সময়ে!
ঘাতক আসক্তি চরস, হেরোইন, ফেনসিডিল,
তামাক সিগারেট ও ড্রাগের ছোবলে
   অনন্ত যৌবন আশাবাহী জীবন হচ্ছে পরাজিত,
দক্ষীণ এশিয় জাতি আজ একীভূত হয়েছে
সিয়াট ফ্রেমের শিখা-২০০০ আমরা গড়েছি মৈত্রী
মাদকাসক্ত মানুষের দুঃখ ক্লেশ ঘুচাবই
মাদকতার প্রচার বন্ধ হোক
ড্রাগ ও সকল প্রকার মাদকতা হতে
নিষ্কৃতি চাই আজ ॥

লেখক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রোগ্রাম অফিসার।

আমিক ও আমিকের দশ বছর

ইকবাল মাসুদ

দেশের ক্রমবর্ধমান মাদকদ্রব্য সামস্যা ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অন্যান্য কর্মকান্ডের পাশাপাশি মাদক বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করে যা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক) নামে পরিচিত। এটি একটি স্বেচ্ছামূলক নেটওয়াকিং প্রোগ্রাম। প্রাথমিকভাবে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক ইনকিলাব-এ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে যারা মাদক বিরোধী কাজ করতে আগ্রহী তাদেরকে আহ্বান জানান হয়। এই আহ্বানের প্রেক্ষিতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। মাদক বিরোধী কর্মকান্ডে অংশ নিতে এগিয়ে আসে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ। আজ পর্যন্ত এই কর্মসূচির আওতায় দেশের ৫৪ টি জেলার ১৫০ টি উপজেলায় ৪০২টি শাখা কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে শাখা কমিটি আমিক-এর এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত করে থাকে।

কেন্দ্রীয় কমিটি

আমিক এর সকল প্রকার কর্মসূচি প্রনয়ন, শাখা গঠনের আবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের যথাযথ পরামর্শ প্রদান করাই কেন্দ্রীয় কমিটির মূলত দ্বায়িত্ব। এছাড়া আমিক-এর শাখা জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের সকল কর্মকান্ডের সমন্বয় এই কমিটি করে থাকে।

দেশের অন্যতম বুদ্ধিজীবি, পেশাজীবি, সমাজ সংগঠক ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে ২১ সদস্য বিশিষ্ট ২ বছর মেয়াদী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।

শাখা কমিটি

উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদ এই ২টি পরিষদের সমন্বয়ে প্রতিটি শাখা কমিটি গঠিত হয়। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের ক্ষেত্রে অনুর্ধ ৩৫ বছরের যে কোন সাধারণ সদস্য কার্যকরী পরিষদের যে কোন পদের যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হলে কার্যকরি পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে প্রশাসন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সমাজসেবা কর্মকর্তা, ডাক্তার, শিক্ষক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে থাকবেন।

উপদেষ্টা পরিষদ- আমিক শাখার সার্বিক কর্মকান্ড তত্ত্বাবধানের জন্য নূন্যতম ৩৫ বছর বয়স্ক সদস্যবৃন্দ তাদের মধ্য থেকে ৭ জন সদস্যের উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়ে থাকে।

আমিকের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "আমিক" তার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছেঃ

- ❒ জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয় (বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সহ) পর্যায়ে তরুণদের নিয়ে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা এবং নেটওয়ার্ক সদস্যদের মাদকতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ❒ জাতীয় মাদকতা নিরোধ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সংগে সহযোগিতা

করা এবং বৈধ-অবৈধ, স্বল্প ক্ষতিকর ও অতিমাত্রায় ক্ষতিকর সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

- তরুণ সমাজ কর্তৃক মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস করা, মাদকদ্রব্যের সরবরাহ বন্ধ করা এবং ক্ষতি হ্রাসের নিমিত্তে মাদক দ্রব্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
- বর্তমান ও সদ্য আরোগ্যপ্রাপ্ত তরুণ মাদকাসক্তদের সভা আহ্বান করা এবং মাদকতা নিরোধ কর্মসূচি সম্পর্কে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ধারণার পর্যালোচনা করা;
- তরুণ সমাজের সংগে ফলপ্রসূ যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মাদকতা বিরোধী পোষ্টার, ষ্টিকার, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা এবং মাদকতা বিরোধী স্বল্প দৈর্ঘ্য ছায়াছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;
- চিকিৎসা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত নির্দেশনা ও উপদেশ, সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মদক্ষতা প্রশিক্ষণ, চাকুরী সংস্থান, নির্দেশনা ও উপদেশ ইত্যাদি প্রদানের জন্য বহুমুখী মাদকতা নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা;
- স্বাস্থ্য-শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় মাদকতা বিরোধী শিক্ষার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের বিকাশ সাধন করা;
- তরুণ মাদকাসক্তদের চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার নিমিত্তে অভিভাবক, শিক্ষক, ক্রীড়া প্রশিক্ষক এবং তরুণদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- মাদকতা বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে পত্রিকা প্রকাশ করা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা;
- মাদকাসক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জরীপ ও গবেষণা পরিচালনা করা;
- মাদকতার প্রতিরোধকল্পে নিয়মিতভাবে অভিভাবকদের, বিশেষ করে মায়েদের সংগে সাক্ষাৎ ও পরামর্শ দানের ব্যবস্থা করা;
- উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলীর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং
- মাদকতা বিরোধী ও যুব-কিশোর উন্নয়নের সাথে জড়িত সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ফেডারেশন ও উদ্যোগের সাথে একযোগে কাজ করা ও সম্পৃক্ত হওয়া।

শাখা পর্যায়ে আমিক

শাখা তার সংশ্লিষ্ট কর্ম এলাকাকে মাদকমুক্ত করার জন্য যে সকল পরিকল্পনা গ্রহন করে তা পর্যালোচনার জন্য স্থানীয় সমাজসেবী, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা, স্কুল কলেজের শিক্ষকসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করে। যদি পরিকল্পনায় কোন দুর্বলতা থাকে তাহলে সকলের মতামতের ভিত্তিতে শাখা কমিটি পরিকল্পনার রদবদল করে এবং নিজস্ব কর্মএলাকায় মাদকদ্রব্য ও ধূমপানমুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরূপ পরিকল্পনার ভিত্তিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ক) ধূমপান মুক্তকরণ

১) একটি নির্দিষ্ট এলাকা/অফিস সম্পূর্ণভাবে ধূমপানমুক্ত করণ;

২) নির্দিষ্ট সংখ্যক (যেমন-১০ জন) লোককে ধূমপান মুক্তকরণ;

৩) কোন অফিস/আদালত/সিনেমা হল/বাস ষ্ট্যান্ড/রেল ষ্টেশন/স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসাকে ধূমপান মুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা।

খ) মাদক মুক্তকরণ

১) একটি নির্দিষ্ট এলাকা সম্পূর্ণভাবে মাদক মুক্তকরণ;

২) স্থানীয় পর্যায়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণ যেমন- মাদক দ্রব্য চোরাচালানকারীকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়া, পুলিশের সহায়তায় মাদক দ্রব্যের বিক্রয়/বিতরণের ঘাটি উচ্ছেদ করা। মাদক দ্রব্য গ্রহণকারীকে সুস্থ করে সমাজে দীর্ঘ মেয়াদী পুনর্বাসন করা;

৩) মাদকাসক্ত তরুণদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে তাদেরকে চিকিৎসার ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

গ) সচেতনতা বৃদ্ধি/প্রচার

১) শাখা কমিটির নির্ধারিত এলাকা সম্পূর্ণভাবে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। প্রয়োজন রোধে কর্মএলাকায় সকল স্কুল, কলেজসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে আমিক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করা;

২) মাদক বিরোধী, সভার আয়োজন করা, যেখানে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতি থাকবে;

৩) মাদক বিরোধী আলোচনা সভা/বিতর্ক অনুষ্ঠান/রচনা প্রতিযোগিতা/ ক্রীড়ানুষ্ঠান/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করা;

৪) পথসভা, র‌্যালির আয়োজন করা;

৫) বাস্তবায়িত কর্মসূচির সংবাদ স্থানীয়/জাতীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করা;

৬) হাতে লেখা পোষ্টার তৈরী করা;

৭) পোষ্টার/দেয়াল পত্রিকা/ষ্টিকার/মাদক বিরোধী সংকলন প্রকাশ করা;

৮) শাখা কমিটির কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট এলাকার উচ্চতর প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং গণ্যমান্য লোকদের নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ঘ) সাংগঠনিক কার্যক্রম

১) কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা;

২) কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা;

৩) গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা/নির্বাচন করা;

৪) মাদক বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য তহবিল সংগ্রহ করা;

৫) শাখার কার্যকরী পরিষদের মাসিক সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করা;

৬) শাখার উপদেষ্টা পরিষদের মাসিক সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করা;

৭) কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সকল অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা।

উপরে বর্ণিত পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণে এবং বাস্তবায়নে শাখা কমিটিকে উদ্বুদ্ধ করা হয় যেন তারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় মাদক বিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে পারে। কেননা ব্যাপক জনমত গঠন ছাড়া কোন আন্দোলন সফল হতে পারে না। প্রয়োজনে শাখা কমিটির কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কিভাবে তারা আরো অধিক মাত্রায় সংগঠিত হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় মাদক বিরোধী কার্যক্রমে গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। অভিভাবকদের তাদের সন্তানের প্রতি আরো সচেতন হওয়ার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয় যেন তাদের সন্তান এই কুঅভ্যাসের শিকার না হয়।

আমিক এর শাখা কমিটিগুলো স্থানীয় পর্যায়ে জনসাধারণের মধ্যে মাদকতার বিরুদ্ধে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করে এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে, শাখা কমিটিগুলো গত এক দশকে যে সকল কর্মসূচি পালন করেছে তার মধ্যে রয়েছে ঃ

ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ থেকে জুন ২০০০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম

মাদক বিরোধী র‍্যালি	-	১৮৯৩	টি	পথসভা	-	১৭৭	টি
মাদক বিরোধী আলোচনা সভা	-	২৮৪৭	টি	ধূমপান মুক্ত এলাকা	-	২৬৮	টি
সেমিনার/সিম্পোজিয়াম	-	৮৯	টি	মাদক মুক্ত এলাকা	-	১২২	টি
ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	-	২৯১	টি	পাঠাগার প্রতিষ্ঠা	-	৩৭	টি
মাষ্টার ট্রেইনার ট্রেনিং	-	২৭৫	জন	ডিটক্স ক্যাম্প	-	১১	টি
স্কিল ট্রেনিং	-	৯৭	টি	ডিটক্সিফিকেশন সেন্টার	-	২	টি
ভলান্টিয়ার ট্রেনিং	-	৫১৩০	জন	সেলফ হেলফ গ্রুপ গঠন	-	১১	টি
কর্মী প্রশিক্ষণ	-	১৭৬	টি	পুনর্বাসন	-	৭৯	জন
ছাত্র প্রশিক্ষণ কোর্স	-	৭১১	টি	বিতর্ক প্রতিযোগিতা	-	১২১	টি
কমিউনিটি ওরিয়েন্টেসন	-	৬১	টি	রচনা প্রতিযোগিতা	-	১৬৩	টি
স্মরণিকা প্রকাশ	-	৩৩	টি				

কেন্দ্রীয়ভাবে এ কর্মসূচির আওতায় আলোচনা সভা, মতবিনিময় সভা, র‍্যালি, গোল টেবিল বৈঠক, সাংবাদিক সম্মেলন, ইত্যাদি কর্মসূচি অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ

আমিক কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মীদের মাদকতা প্রতিরোধ বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণে নিম্নোক্ত বিষয়াদির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

- মাদকতার ক্রমবিকাশ এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদকাসক্তির বর্তমান অবস্থা
- মাদকাসক্তির লক্ষণ সমূহ
- মাদকাসক্তি থেকে সৃষ্ট সমস্যাবলী
- মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকার উপায়
- মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধে বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা
- মাদকাসক্তি সৃষ্ট সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধানের উপায়

- গণজাগরণ ও উদ্বুদ্ধ করণ
- আমিক কর্মী ও স্কুল প্রশিক্ষণ
- শাখা ব্যাবস্থাপনা
- প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ
- মাষ্টার ট্রেইনারদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
- প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের থাকা, খাওয়া ও যাতায়াতের সার্বিক খরচ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণগুলি অংশগ্রহণ মূলকভাবে পরিচালনা করা হয়। এর ফলে সকল প্রশিক্ষনার্থী যথেষ্ট আন্তরিকভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাষ্টার ট্রেইনাররা সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে প্রথমে আমিক কর্মী প্রশিক্ষণ ও পরবর্তিতে ৫টি স্কুল প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

দিবস উদ্‌যাপন

মাদকতা বিরোধী গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষে আমিক শাখা কমিটি এবং কেন্দ্রীয়ভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ পালন করে থাকে। নিম্নে দিবস সমূহের নাম প্রদান করা হল-

- ৩১শে মে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস
- ২৬শে জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যাবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস
- ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস্ দিবস এবং
- মিশন প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী
- আমিকের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

এই দিবসগুলো পালন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটি সেমিনার আলোচনা সভা ও র‍্যালী ইত্যাদি কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। শাখা কমিটিগুলো নিজ নিজ এলাকায় আলোচনাসভা, র‍্যালী, পথসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মাইকিং, স্মরণিকা প্রকাশ নাটক এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতার মতো বিভিন্ন সচেতনতা সৃষ্টি মূলক অনুষ্ঠান করে থাকে।

পুরস্কার প্রদান

আমিক শাখা কমিটি সমূহের প্রতি এক বছরের প্রশংসামূলক কাজের জন্য আমিক কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রেষ্ঠ তিনটি শাখাকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করে থাকে। পুরস্কার প্রাপ্ত শাখাগুলিকে নগদ টাকা এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

উপকরণ প্রকাশ

মাদক বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে আমিক এ পর্যন্ত সে সকল উপকরণ প্রকাশ করেছে তা হলোঃ

- পোষ্টার - ৯ প্রকার - ১ লক্ষ ৩০ হাজার
- লিফলেট - ৪ প্রকার - ৪০ হাজার
- ষ্টিকার - ৬ প্রকার - ৬০ হাজার
- বুকলেট - ১ প্রকার - ১০ হাজার
- ফ্লিপচার্ট - ১ প্রকার - ১০ হাজার.

এই সমস্ত উপকরণ শাখা কমিটির মাধ্যমে সারা দেশে বিতরণ করা হয়।

চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ঃ

মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি যে সকল তরুণ ও যুবক ইতোমধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে তাদের চিকিৎসার জন্য আমিক স্থানীয় পর্যায়ে ডিটক্স ক্যাম্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৬৭ জন আসক্তকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। এই সেবার আওতায় চিকিৎসা পরবর্তি সেলফ হেলফ গ্রুপ গঠন ও কাউন্সিলিং করা হয়। ডিটক্স ক্যাম্পে চিকিৎসার পরে আরোগ্য প্রাপ্তদের পুনর্বাসনের জন্য তাদের পরিবারকে সেলাই মেশিন ও রিক্সা প্রদান করা হয় হয়েছে । এ পর্যন্ত ৭৯ জনকে বিভিন্ন ভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

উল্লেখিত কার্যক্রমগুলো ছাড়াও আমিক সবসময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং বৃহত্তর ইস্যুতে সম্মিলিতভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে Colombo Plan, UNDCP, ICCA, ESCAP, WHO, UNESCO এবং জাতীয় পর্যায়ে NCCADN, National STD/AIDS Network, Anti Tobacco Alance, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য।

আগামীতে এই মাদক বিরোধী কার্যক্রমকে আরো সম্পসারিত করা এবং স্থায়ীভাবে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের সঠিক চিকিৎসা প্রদান এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমিক-এর এই কার্যক্রমে সকলের আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন পেলে মাদকের ভয়াবহ কুফল থেকে জাতীকে রক্ষা করা সমম্ভব হবে।

মিশনের নির্বাহী পরিচালক মাদক বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থার বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর সদস্য নির্বাচিত

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক কাজী রফিকুল আলম সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অন এ্যালকোহল এন্ড এডিকশনস' (আইসিএএ)-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, তিনিই এই মর্যাদাবান আন্তর্জাতিক সংস্থার বোর্ড অব ডিরেক্টরর্স-এর একজন প্রথম বাংলাদেশী সদস্য। স্পষ্টতই মাদক বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি হিসেবে তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে এই পদে নির্বাচিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আইসিএএ-র অন্যতম সদস্য।

প্রতিবেদক আমিক সেল-এর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা এবং যুগ্ম সদস্য সচিব, আমিক কেন্দ্রীয় কমিটি।

এ দেশে প্রচলিত মাদকদ্রব্য

মাদকাসক্তদের সঙ্গে কথা বলে যে সব মাদকদ্রব্য গ্রহণের তথ্য পাওয়া গেছে, তা হলো আফিম জাতীয় মাদকদ্রব্য যেমন- হেরোইন, ফেনসিডিল, টিডিজেসিক, পেথিডিন ও আফিম ঘুমের ওষুধ, ট্রাংকুলাইজার ক্যানাবিস জাতীয় মাদকদ্রব্য যেমন গাজাঁ, চরস ও ভাং।

হেরোইন: হেরোইন আফিম থেকে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য। এই মাদকদ্রব্য প্রায়ই সাদা অথবা বাদামী পাউডারের আকারে বিক্রি করা হয়। এই পাউডার সাধারনতঃ গুঁড়ো দুধ, ময়দা, সার এবং নানা রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি করা হয়। নস্যির মত টেনে অথবা ধূমপানের সাহায্যে এটি গ্রহণ করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইনজেকশনের মাধ্যমে এর বিপজ্জনক অপব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ফেনসিডিল: ফেনসিডিল একটি ওষুধ যার মধ্যে রয়েছে আফিম জাতীয় দ্রব্য কোডিন ফসফেট। এই ওষুধ বাংলাদেশে অবৈধ। ফেনসিডিল একটি সিরাপ জাতীয় ওষুধ এবং এর গন্ধ তীব্র।

টিডিজেসিক ও পেথিডিন: টিডিজেসিক একটি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী আফিম জাতীয় মাদকদ্রব্য যা এদেশে ইনজেকশনের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়।

পেথিডিন বেদনা-নাশক হিসেবে ব্যবহৃত একটি কৃত্রিম মাদকদ্রব্য। সাধারণত এটি ইনজেকশনের মাধ্যমে নেয়া হয়।

আফিম: পপি ফুলের বীজ থেকে আফিম প্রস্তুত করা হয়। গাঢ় বাদামী রং এর টুকরো অথবা পাউডার আকারে এটি আসে। খাওয়া এবং ধূমপানের মাধ্যমে সাধারণত ব্যবহার করা হয়।

ট্রাংকুলাইজার: ট্রাংকুলাইজার হচ্ছে বিষণ্নতা, উদ্বেগ-বোধ অথবা নিদ্রাহীনতা লাঘবে ব্যবহৃত কিছু মাদক জাতীয় ওষুধ। ট্রাংকুলাইজার সাধারণত ট্যাবলেট অথবা ক্যাপসুল আকারে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সুপরিচিত কয়েকটি ট্রাংকুলাইজার হচ্ছে ডায়াজিপাম য়া ভ্যালিয়াম, রিলাক্সেন, সেডিল ইত্যাদি নামে পরিচিত, লোরাজিপাম অথবা এ্যটিভান, ক্লোরডায়াজিপোক্সাইড অথবা লিব্রিয়াম।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অতিমাত্রায় ট্রাংকুলাইজার গ্রহণ করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। তাহলে সেটি নেশা জাতীয় দ্রব্যে পরিণত হয় এবং নানা রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

ঘুমের ওষুধ: ঘুমের ওষুধ (সেডিটিভ-হিপনোটিক্স্) সেই সকল মাদকদ্রব্য যা তন্দ্রাভাব এবং নিদ্রা অবস্থার সৃষ্টি করে। এগুলো বিভিন্ন ট্রাংকুলাইজারের অনুরূপ কেবল পার্থক্য এই যে, নিদ্রা আনয়নে এগুলোর কার্যকারিতা বেশী এবং দীর্ঘস্থায়ী। বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক ধরনের ঘুমের ওষুধ রয়েছে যার মধ্যে নাইট্রাজেপাম নামক ওষুধটি ব্যপক ব্যবহৃত হচ্ছে।

ঘুমের ওষুধ শরীরকে নির্জীব করে ফেলে, এর ফলে ব্যবহারকারী তন্দ্রাভাব বোধ করে। অপ্রয়োজনীয় ও অতিমাত্রায় ঘুমের ওষুধের ব্যবহার নির্ভরশীলতাও আসক্তি সৃষ্টি করে থাকে।

গাঁজা: গাঁজা এক ধরনের উদ্ভিদ জাতীয় মাদকদ্রব্য। বাংলাদেশে একই শ্রেণীর আর যে সব মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে - হাশিশ, হাশ তৈল, ভাং। হাশিশের দেশীয় নাম চরস এবং ভাংকে সিদ্ধি বলা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রকাশিত বুকলেট থেকে সংগৃহীত।

তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব

- তামাকের কারণে পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে ১ জন লোক মারা যায়।
- তামাকে ৪০০০ এরও বেশী রাসায়নিক দ্রব্য আছে, যা হৃদরোগ, ষ্ট্রোক এবং ক্যান্সারসহ ২৫টি রোগের কারণ।
- ২০৩০ সাল নাগাদ তামাকের কারণে বছরে ১ কোটি লোক মারা যাবে যার ৭০ লক্ষই দরিদ্রতম দেশগুলোতে।
- আগামী ৩০ বছরে বিশ্বব্যাপি তামাক জনিত মহামারীর ফলে ২৫ কোটি শিশু-কিশোর-কিশোরীর অকাল মৃত্যু ঘটবে।
- তামাকের নিকোটিনের আসক্তি হেরোইন, কোকেন, মারিজুয়ানা এবং এলকোহলের চেয়েও শক্তিশালী।
- বাংলাদেশে প্রতি বছর ৭৫০০০ লোক শুধুমাত্র তামাক জনিত ক্যান্সারে মারা যায়।
- শিশুদের ধূমপানের সম্ভাবনা তিনগুণ বেড়ে যায় যদি তাদের পিতা-মাতা ধূমপান করে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের সাজা

পরিমান	মাদকদ্রব্য	সাজা
২৫ গ্রামের কম	হেরোইন	২-১০ বৎসর কারাদণ্ড
২৫ গ্রামের বেশী	কোকেন	মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
১০ গ্রামের কম	পেথেডিন	২-১০ বৎসর কারাদণ্ড
১০ গ্রামের বেশী	মরফিন	মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
১০ লিটারের কম	এ্যাবসলিউট এ্যালকোহল	৬ মাস-৩ বৎসর কারাদণ্ড
১০ লিটারের বেশী	দেশী/বিদেশী মদ ও বিয়ার	৩-১৫ বৎসর কারাদণ্ড
৫ কেজির কম	গাঁজা বা	৬ মাস-৩বৎসর কারাদণ্ড
৫ কেজির বেশি	ভেষজ ক্যানাবিস	৩-১৫ বৎসর কারাদণ্ড

গণমাধ্যমে আমিক কার্যক্রম

মাদকের খারাপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকিতে হইবে

মাদকবিরোধী দিবস পালিত

BANGLADESH OBSERVER
THURSDAY JUNE 29 2000

...যোগিতার মাধ্যমে মাদকাসক্তি প্রবণতা রোধ করা সম্ভব

International Day Against Drug abuse today

Staff Correspondent

Dhaka Ahsania Mission will hold discussion at Dhanmondi Women Voluntary Association auditorium on the occasion of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Health officer of Dhaka City Corporation (DCC) Dr. M Ashraf Uddin will present keynote paper while former Inspector General of Police Dr. M. Enamul Haq will preside. UNDCP consultant Dr. Shamim Chowdhury, National Programme Officer of WHO Brigadier (retd) Dr. Q.M.S. Hafij and Prof. Dr. Rowshan Ara among others will take part in the discussion.

ঢাকা আহছানিয়া মিশনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

Drug abuse day observed

Dhaka Ahsania Mission has organised a discussion meeting on Monday at 4:00 p.m. at Mission's Dhanmondi Auditorium on the occasion of International Day against drug abuse and illicit trafficking, says a Press release.

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার, ২৬শে বৈশাখ

আজ বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস

ঢাকা আহছানিয়া মিশন

Discussion on World Tobacco Day

A discussion meeting will be held today at 3 PM in the Auditorium of the Dhaka Ahsania Mission at Dhanmondi, Dhaka (House # 19, Road # 12 (new), Dhanmondi R/A, Dhaka-1209) under the auspices of the Dhaka Ahsania Mission.

State Minister, Ministry of Foreign Affairs, Govt. of Bangladesh Mr Abul Hasan Chowdhury will be present at the meeting as the chief guest while Director General of Bangladesh Betar Mr M. I Chowdhury will be the special guest. Dr. Arup Ratan Choudhury, founder President of 'Manas' will present the keynote paper at the meeting.

মাদকবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালিত

জাতীয় জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও অনুশাসন সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে পারে

ভোরের কাগজ

ধূমপান মুক্ত বাঁচবে বহু প্রাণ

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস আজ

সংবাদ

মাদক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর ওপর প্রশিক্ষণ

গণমাধ্যমে আমিক কার্যক্রম

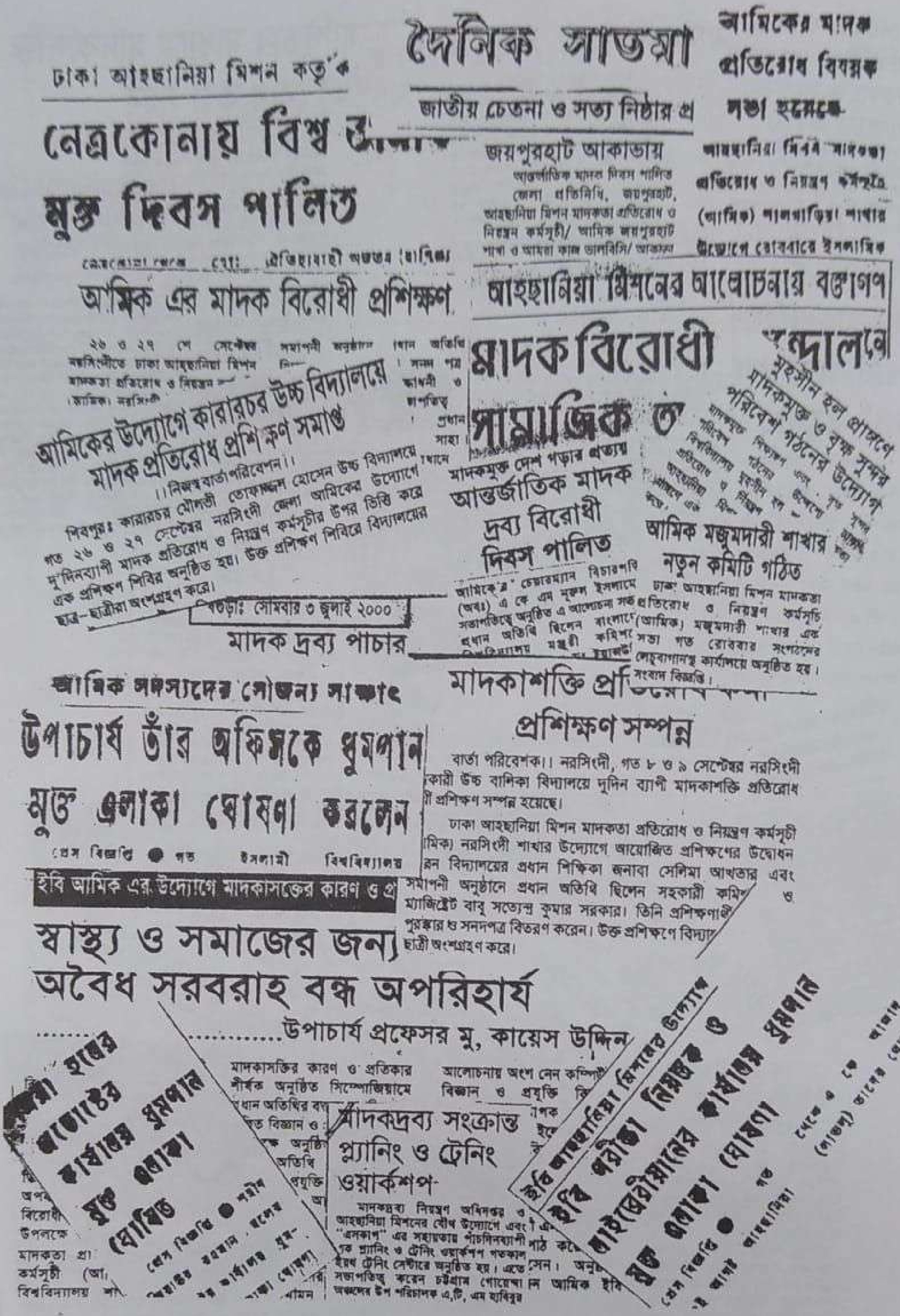

দৈনিক আত্মা
জাতীয় চেতনা ও সত্য নিষ্ঠার প্র

ঢাকা আহছানিয়া মিশন কর্তৃক
নেত্রকোনায় বিশ্ব ...
মুক্ত দিবস পালিত

আমিকের মাদক প্রতিরোধ বিষয়ক সভা হয়েছে

জয়পুরহাট আকাভায়

আমিক এর মাদক বিরোধী প্রশিক্ষণ

আহছানিয়া মিশনের আলোচনায় বক্তাগণ
মাদক বিরোধী আন্দোলনে সামাজিক ...

আমিকের উদ্যোগে কারারচর উচ্চ বিদ্যালয়ে মাদক প্রতিরোধ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

।। নিজস্ব বার্তা পরিবেশন।।
শিবপুরঃ কারারচর মৌলভী তোফাজ্জল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর নরসিংদী জেলা আমিকের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী মাদক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে।

বগুড়াঃ সোমবার ৩ জুলাই ২০০০
মাদক দ্রব্য পাচার

মাদকমুক্ত দেশ গড়ার প্রত্যয়
আন্তর্জাতিক মাদক দ্রব্য বিরোধী দিবস পালিত

সুহাসীন হল প্রাঙ্গণে মাদকমুক্ত ও বৃক্ষ সুন্দর পরিবেশ গঠনের উদ্যোগ

আমিক মজুমদারী শাখার নতুন কমিটি গঠিত

আমিক সদস্যদের সৌজন্য সাক্ষাৎ
উপাচার্য তাঁর অফিসকে ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণা করলেন

মাদকাশক্তি প্রতিরোধ ...
প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

বার্তা পরিবেশক।। নরসিংদী, গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর নরসিংদী ...কারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে দুদিন ব্যাপী মাদকাশক্তি প্রতিরোধ ...ী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী (আমিক) নরসিংদী শাখার উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ...ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জনাবা সেলিমা আখতার এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী কমি... ও ম্যাজিস্ট্রেট বাবু সত্যেন্দ্র কুমার সরকার। তিনি প্রশিক্ষণার্থী... পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে বিদ্যা... ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

ইবি আমিক এর উদ্যোগে মাদকাসক্তের কারণ ও প্র...
স্বাস্থ্য ও সমাজের জন্য অবৈধ সরবরাহ বন্ধ অপরিহার্য
.........উপাচার্য প্রফেসর মু, কায়েস উদ্দিন

...হলের প্রভোস্টের কার্যালয় ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষিত

মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত প্ল্যানিং ও ট্রেনিং ওয়ার্কশপ

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে
ইবি প্রক্টর, রেজিস্ট্রার ও লাইব্রেরীয়ানের কার্যালয় ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণা

আমিক প্রকাশিত পোস্টার

আমিক প্রকাশিত পোস্টার

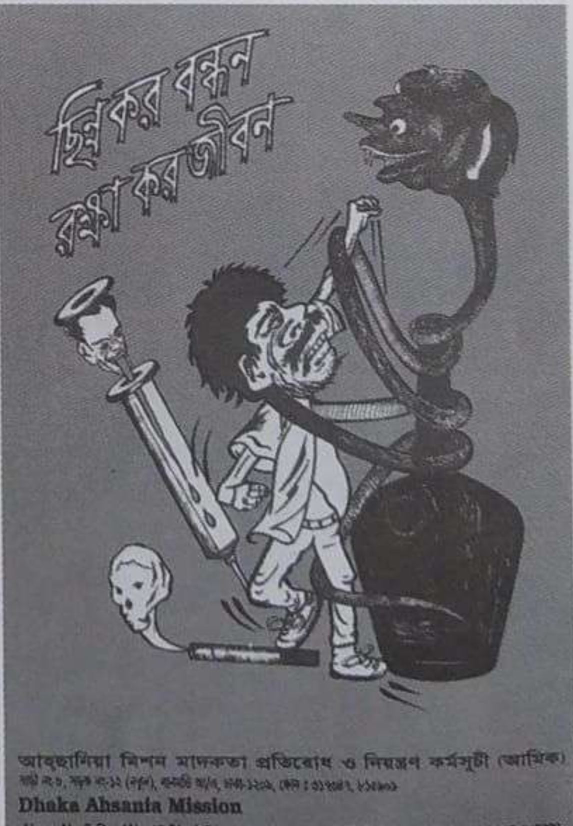

আমিক প্রকাশিত স্টিকার

চিত্রে আমিক কার্যক্রম

বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব আবুল হোসেন চৌধুরী

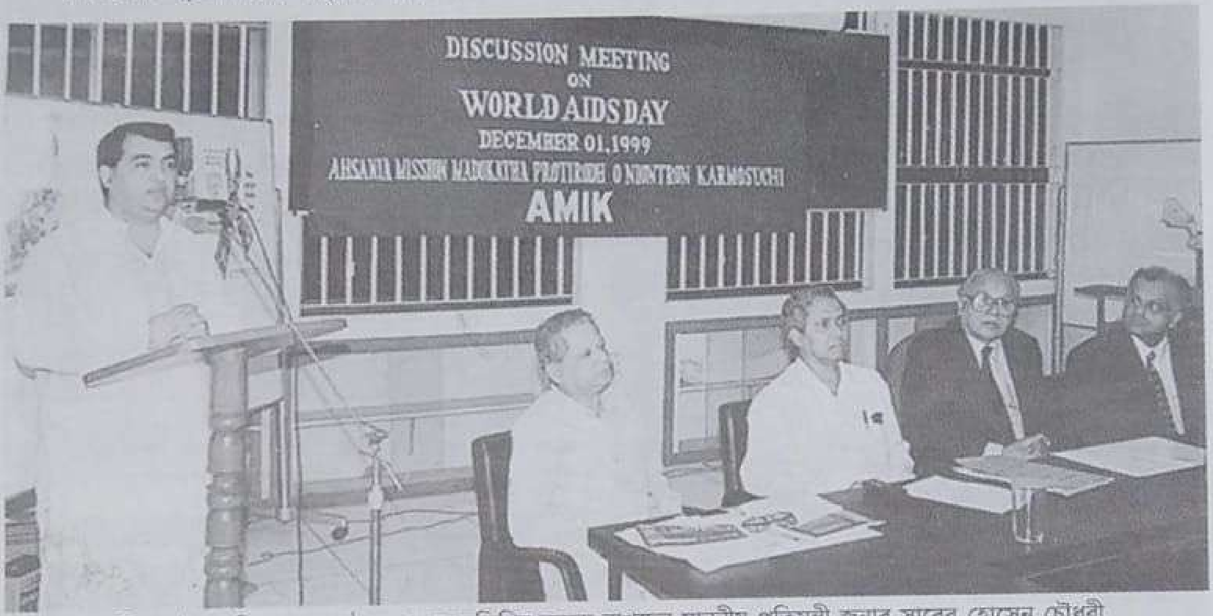

বিশ্ব এইডস্ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী

আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবসে পুরস্কার বিতরণ করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব নাজমুল হাসান চৌধুরী

চিত্রে আমিক কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবসে আমিক সেলের র‍্যালী

বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবসে ইউ.এস.এস (দিনাজপুর) শাখার র‍্যালী

আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবসে আমিক যাত্রাবাড়ি ক্রীড়াচক্র শাখার র‍্যালী

চিত্রে আমিক কার্যক্রম

আমিক কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত মাষ্টার ট্রেইনার ট্রেনিং

পাবনা এফ. পি. এ. বি শাখা কমিটি আয়োজিত স্কুল শিক্ষক ও ইমাম ওরিয়েন্টেশন

আমিক কিশোরগঞ্জ শাখা আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্ট

চিত্রে আমিক কার্যক্রম

ডিটক্স ক্যাম্পে মাদকসেবীদের চিকিৎসা

আমিক পল্লী অগ্রগতি সংস্থা (গাইবান্ধা) শাখার সহায়তায় উদ্ধারকৃত ফেনসিডিল

ইউ. এন. ডি. সি. পি (ভিয়েনা) প্রতিনিধির ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিদর্শন

ভয়েজ অব ডিসকভারী আগমনের প্রতিবাদে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব কাজী রফিকুল আলম

আমিক কেন্দ্রীয় কমিটি

●	বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম	প্রেসিডেন্ট	প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
●	ডাঃ এম. এনামুল হক	ভাইস প্রেসিডেন্ট	(অবঃ) আই. জি.পি. ঢাকা।
●	অধ্যাপক এম. এ. মোমেন	ভাইস প্রেসিডেন্ট	সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
●	অধ্যাপক ডাঃ নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী	ভাইস প্রেসিডেন্ট	মনোবিজ্ঞানী, ঢাকা
●	জনাব খন্দকার জাকিউর রহমান	সদস্য সচিব (ভারপ্রাপ্ত)	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
●	ইকবাল মাসুদ	যুগ্ম সদস্য সচিব	পরিবেশ ও মাদক বিরোধী সেলের দায়িত্বে নিয়োজত কর্মকর্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
●	অধ্যাপিকা রওশন আরা	কোষাধ্যক্ষ	দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
●	মিসেস সাজেদা হুমায়ুন কবির	সদস্য	সমাজ সেবক
●	জনাব মোঃ মাহাবুব আলম	সদস্য	সম্পাদক, দি ইনডিপেন্ডেন্স, কাওরানবাজার, ঢাকা
●	জনাব কাজী রফিকুল আলম	সদস্য	নির্বাহী পরিচালক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
●	অধ্যাপক আব্দুল হাকিম সরকার	সদস্য	সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
●	ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভূঁইয়া	সদস্য	এম.পি
●	ডাঃ শামীম মতিন চৌধুরী	সদস্য	চীফ কনস্যালট্যান্ট মাদকাসক্তি নিরাময় হাসপাতাল, ঢাকা।
●	ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম.এম. ফিরোজ	সদস্য	পরিচালক (প্রশাসন) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
●	ব্যারিষ্টার তানিয়া আমীর	সদস্য	ল এসোসিয়েটস, ঢাকা।
●	ডাঃ মোঃ আশরাফ উদ্দিন	সদস্য	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।
●	অধ্যাপিকা বশিরা মান্নান	সদস্য	সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
●	জনাব এম. এহ্ছানুর রহমান	সদস্য	পরিচালক (কর্মসূচি) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
●	জনাব আজাদ রহমান	সদস্য	মহাপরিচালক, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা
●	জনাব রশিদুল হক	সদস্য	পরিচালক (নিশি) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
●	ব্যারিষ্টার শামসুদ্দিন চৌধুরী	সদস্য	ডেপুটি এটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত

মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী (আমিক)

এর দশ বছর পূর্তিতে

আমাদের সাদর অভিনন্দন

স্কয়ার

ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড

উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

আমিকের ভিশন

- স্থানীয় জনগণ তামাক এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতন হবে এবং কর্মএলাকার জনগণ সাংগঠনিকভাবে নিজেরাই সচেনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।
- সাংগঠনিক উদ্যোগে স্থানীয় এলাকায় মাদকতা বিরোধী সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।
- স্থানীয় উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সহায়তায় আসক্তদের সুষ্ঠু চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পূনর্বাসনের কার্যকরী পদক্ষেপ নেবে।
- প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি বা যুবকরা স্থানীয় সরকারী/বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্যোগী হবে।
- সামাজিক ব্যাধি হিসাবে HIV/AIDS সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সাংগঠনিকভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন
বাড়ী নং- ১৯, সড়ক নং -১২ (নতুন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন : ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৯৫২১-২